প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক

সুরজিৎ ঘোষ

প্রমা প্রকাশনী । ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ

কলকাতা—১৭

মুদ্রাকর

মন্মথ সিংহ রায়

রূপলেখা । ২২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা—৯

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট । ৭/১ বিধান সরণী

কলকাতা—৬

অরুণ মিত্র র অন্যান্য অনুবাদ ও প্রবন্ধ-গ্রন্থ

কাঁদিদ	সাহিত্য অকাদেমী	১৯৭০
ভারতীয় থিয়েটার	ন্যাশনাল বুকট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া	১৯৭৫
গাছের কথা	ন্যাশনাল বুকট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া	১৯৭৫
মায়াকোভ্স্কি	প্রমা প্রকাশনী	১৯৭৯
ভারতবর্ষের সাপ	ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া	১৯৮০
সার্ত্র্ ও তাঁর শেষ সংলাপ	প্রমা প্রকাশনী	১৯৮১

নিবেদন

ফরাসী সাহিত্য বিষয়ে আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় যে-সব নিবন্ধ লিখেছি, তাদের অধিকাংশ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত। সময়টা প্রত্যেক রচনার শেষে উল্লেখ করেছি।

কোনো কোনো রচনায় যে কিছু পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সে সম্বন্ধে আমি অবহিত। সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট কালের মধ্যে বিষয়ের আত্মীয়তা এর মূল কারণ। পরে এই সব অংশ আমি বদ্‌লাতে গিয়েও কিন্তু শেষ পর্যন্ত বদ্‌লাইনি। কেননা আমার মনে হয়েছে এ-ধরনের পুনরুল্লেখ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় নয়। যেমন, কোনো নিবন্ধে হয়তো কোনো লেখক-লেখিকার বিষয়ে অল্প কিছু বলা হয়েছে, কিন্তু পরে তাঁরা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছেন। আশা করি, পাঠক-পাঠিকাদেরও তা বাহুল্য মনে হবে না।

এ-গ্রন্থে যে-সব বিবরণধর্মী রচনা আছে তারা আমার নিজস্ব সঙ্কলন ও মূল্যায়নের ফসল, এমন দাবী আমার নেই। তথ্য সবই সাহিত্য-ইতিহাসের অন্তর্গত, এবং ভাষ্যের নানা জায়গায় ফরাসী আলোচকদের অভিমত প্রতিধ্বনিত। তবে আমার বিচার অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য ও ভাষ্য থেকে নির্বাচনের এবং তা উপস্থাপন ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমি নিয়েছি।

ফরাসী শব্দের বাংলা আকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা দরকার। ফরাসী উচ্চারণ বাংলা অক্ষরে প্রকাশ করা সম্ভব নয় (বস্তুত যে-কোনো দুই ভাষার ক্ষেত্রেই এ-কথা প্রযোজ্য)। আমি শুধু চেষ্টা করেছি মূল উচ্চারণের যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকতে; কোনো কোনো বিশেষ ধ্বনিকে আমি কৃত্রিমভাবে চিহ্নিত করেছি যাতে অন্য ধ্বনির সঙ্গে তাকে অভিন্ন না ভাবা হয়। যেমন, ফরাসী u স্বরধ্বনিকে বাংলা উ ধ্বনি থেকে পৃথক করার জন্যে য-ফলা উ-কার লিখেছি। ফরাসী উচ্চারণ লিখতে কেউ কেউ যেখানে বাংলা জ ব্যবহার করেন, সেখানে আমি ঝ ব্যবহার করেছি এই কারণে যে, বাংলা জ ব্যঞ্জনধ্বনি ফরাসীতে নেই, যা আছে তা কতকটা ঝ অভিমুখী (ইংরিজী pleasure-এর s-এর মতো, অবশ্য হুবহু নয়)। কোনো ভারতীয়ের জিভ কুলিয়ে উঠতে না পারলে এই ফরাসী ধ্বনি যে ঝ হয়ে যায় তা আমি একাধিক ব্যক্তির উচ্চারণে শুনেছি। সম্ভব হলে মুদ্রণে এ-ধ্বনিকে চিহ্নিত করতে ঝ-এর নিচে ফুট্‌কি দেওয়া ভালো, যেমন z ধ্বনিকে চিহ্নিত করতে জ-এর নিচে ফুট্‌কি।

সূচি

কাব্যের মুক্তি : ফরাসী প্রয়াস

ফরাসী কাব্য-জগতে বোদলের "নতুন শিহর সৃষ্টি" করছেন, এ কথা বলেছিলেন একশো বছর আগে কবিগুরু ভিক্তর য়্যুগো। কিন্তু তখন তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না এ-শিহর কী প্রবলভাবে সঞ্চারিত হবে সমগ্র ফরাসী সৃষ্টি-চেতনায়। গত একশো বছর ধ'রে ফ্রান্সের বিভিন্ন কাব্য-আন্দোলনের আদিপুরুষ বোদলের। তিনিই আধুনিকতার জনক।

অবশ্য সাহিত্যে যে এক নতুন কালের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে তার আভাস ছিল বোদলের-এর অগ্রজদের মধ্যে। গদ্যের মাধ্যমে রুসো এবং শাতোব্রিয়াঁ এ-প্রস্তুতির পুরোধা এবং কবি লামার্তিন, ভিঞি, য়্যুগো ও নের্ভাল-এর মধ্যে দিয়ে তার অগ্রগতি। ক্লাসিক যুক্তিবাদিতা থেকে চেতনাকে মুক্ত ক'রে কল্পনার বিহারে তাকে মেলে ধরা, তাকে ব্যক্তিগত অনুভূতিতে মিশিয়ে দেওয়া, নিজের আন্তর সত্তায় বস্তু-প্রকৃতিকে নতুন ক'রে গ'ড়ে নেওয়া, এই রোমান্টিক ধারা নিয়ে এলেন রুসো। ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্গাতা য়্যুগো বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ধারাকে তাঁর কোনো কোনো সৃষ্টিতে নিয়ে গেলেন আরো গভীর স্তরে। তিনি ইঙ্গিত দিলেন এক অদৃশ্য জগতের। বোদলের নিজেই বললেন, য়্যুগো "সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ, জীবনের রহস্য প্রকাশের জন্যে স্পষ্টতই নির্বাচিত।" তারপর নের্ভাল-এর যাত্রা স্বপ্নের পথে। রাত্রির কপাট উন্মুক্ত করার জন্যে তাঁর প্রয়াস উন্মত্ততায় পৌঁছেছিল। কল্পনায় আত্মার নিরালোক গহনে নেমে তিনি এমন কাব্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যা হবে ইন্দ্রজাল।

এসব প্রচেষ্টার মূল কথা: কাব্য অন্তর্মুখী হল। বোদলের এই অন্তর্মুখিনতারই কবি। কিন্তু তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য আগামী কালের দৃষ্টিতে কতকগুলি বিশেষ ধর্মে পরিস্ফুট। তাদের মধ্যে এটাই প্রধান যে, তিনি কাব্যকে সম্পূর্ণভাবে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত করলেন, তাঁর হাতে কাব্য ও জীবনের মধ্যে ব্যবধান ঘুচে গেল। স্ব-বিরোধিতায় ভরা আধুনিক মানুষের

জটিল মন হল তাঁর একমাত্র ধ্যান। অবশ্য এই মন তাঁর নিজেরই মন। তবে এও ঠিক যে, যে-মানুষ তাঁর মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল সে অধঃপতনের যুগের মানুষ, অবক্ষয়ের মানুষ। তবু আমাদের সমাজেরই মানুষ। যে-সময়ে দ্বন্দ্বে ও সংশয়ে তার হৃদ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিধ্বস্তপ্রায়, সে সময়ে বোদলের অন্তরের বিশৃঙ্খলা অনুভব ক'রে রোমান্টিকদের চেয়ে পরিষ্কারভাবে বাস্তবকে উপলব্ধি করলেন।

অর্থাৎ জীবনই হল বোদলের এর চেতনায় কাব্যের অঙ্গীকার। তিনি নিজের জটিল পরস্পর-বিরোধী মনোবৃত্তি অন্বেষণ ক'রে আধুনিক জীবন-নাট্যের প্রকৃতিকে ধরবার চেষ্টা করলেন। সেখানে যে তিনি শুধু বুদ্ধি ও হৃদয়ের বিরোধ দেখলেন তাই নয়। অন্য জিনিসও লক্ষ্য করলেন, তাঁর নিজের ভাষায়: "যুগপৎ দুটো স্বীকৃতি, একটার গতি ভগবানের দিকে, আর একটার শয়তানের দিকে।" বস্তুত, তাঁর এই দ্বন্দ্ব বরাবরকার। নিজেই লিখেছেন দিনপঞ্জিতে: "শৈশবেই আমি আমার হৃদয়ে দুটি বিরোধী বৃত্তি অনুভব করেছি: জীবনের বিভীষিকা এবং উল্লাস।"

বোদলের-এর মধ্যে একদিকে জীবনের অনুভূতি সর্বাঙ্গ দিয়ে, অন্যদিকে জীবনকে অতিক্রম ক'রে স্বপ্নপ্রয়াণ। তাঁর অনুভূতির খরতা সর্বত্র: প্রেম, বিষাদ, স্বপ্ন, এমনকি মৃত্যুর ছোঁয়া অনুভূতির পথেই আসে (Les Fleurs du Mal-এর একটা প্রধান সুর মৃত্যুর)। নিজের মধ্যে ছায়ারাজ্যে অবতরণ ক'রে কী খুঁজে পান তিনি? স্বপ্ন: "জীবনের একটা অতিপ্রাকৃত দিক" তো বটেই, কিন্তু সেই সঙ্গে শয়তানের ছায়া। এক কথায়, তিনি অজ্ঞাত রাজ্যে পৌঁছে নিজের সত্তারই সাক্ষাৎ পান। এদিক থেকে তাঁর কাব্যসৃষ্টি নিছক কবিতা লেখা নয়, তা হল engagement total। কাব্য এখন থেকে হল জীবন দিয়ে তৈরি, তার আকাঙ্ক্ষাও হল জীবনকে তার গহনতম উৎসে ধরা। দৈনন্দিন থেকে নিষ্কাষিত করতে হবে "সেই আশ্চর্যকে যা আমাদের পরিবৃত ক'রে আছে, আমাদের সিক্তিত করছে আবহাওয়ার মতো।"

অবশ্য বোদলের কোনো এক সরল রেখায় চলেননি, দ্বন্দ্ব ও পরস্পর-বিরোধিতায় তাঁর গতি জটিল। জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়েও তিনি জীবনের ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছেন। অন্যরাজ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, কিন্তু নিজের পার্থিব সত্তাকে, জীবনকে কোথাও এড়াতে পারেননি অথবা এড়াতে চাননি।

মনে হয়, এই সংঘাত ও দ্বিমুখী প্রকৃতির জন্যেই তাঁর পরিণতি র‍্যাঁবো বা মালার্মের মতো হয়নি।

বোদলের মুক্তি খুঁজেছেন স্বপ্নপ্রয়াণে : "সত্যিকার বাস্তব হল স্বপ্নে", কিন্তু মানুষের সাধারণ স্বপ্নে নয়, "অবিশ্বাস্য অদৃষ্টপূর্ব স্বপ্নে...হায়ারোগ্লিফিক স্বপ্নে, যা জীবনের অতি-প্রাকৃত দিককে উন্মোচিত করে।" শুধু তাই নয়, তাঁর কাছে এ-স্বপ্ন এক অতি-বাস্তবকে উপলব্ধি করবার একটা পদ্ধতিও বটে : "আমাদের সুস্থিত বিশ্ব সেই অতি-বাস্তবের এক সহজীকরণ মাত্র, বলা যায় তার এক ক্যারিকেচার।" কল্পনার আগল খুলে এই স্বপ্নরাজ্যে বিচরণের জন্যে কোনো মত্ততাই তিনি বাকি রাখেননি। বোদলের-এর পরবর্তীকালে এই ধারায় র‍্যাঁবো এবং লোত্রেয়াম'র আবির্ভাব। কিন্তু এ পথ তো মায়াময়। র‍্যাঁবো উনিশ বছর বয়সেই কাব্যের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বাক্যের অ্যালকেমি দিয়ে জীবনকে বদলানো গেল না, অতএব লেখার চেয়ে বাঁচাই ভালো, এই কি তাঁর অব্যক্ত ঘোষণা নয়? নাকি স্যুররেয়ালিস্ট যুগের একটা বক্তব্যকে তিনি আগে থেকেই ঘোষণা ক'রে গেলেন, যার মর্ম হল এই যে, কাব্যের চরম মুক্তি হয়ে গিয়েছে, তার কোনো বিশেষ আকার আর নেই, আর্ট বা সাহিত্যের সঙ্গে আর সে আবদ্ধ নয়, অতএব কবিতা এখন থেকে না লিখলেও চলে?

একদিকে, বোদলের তাঁর ট্র্যাজিক দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা করেছেন অনুভূতির সীমায় এক কল্পজগৎ গ'ড়ে যার উদ্দেশ্য হল এক "কাব্যিক দশা"র সঞ্চার; অন্য দিকে, তারই অপর পিঠ হিসেবে তিনি জড় প্রকৃতিকে বদলে নিতে চেয়েছেন। প্রকৃতিকে তিনি বলেছেন "প্রতীকের এক অরণ্য।" এই দৃশ্য জগতের পেছনে যে-সত্যিকার জগৎ বিদ্যমান, এখানকার সব কিছুই তার উপমা। এ-সব উপমার নিজস্ব অনড় কোনো মূল্য না থাকায় এবং সবই গুপ্ত অর্থের ব্যঞ্জনা ব'লে একের সঙ্গে অপরের কোনো কৃত্রিম ভেদ নেই। বর্ণ গন্ধ ও স্বর, একে অপরের ইঙ্গিত দেবে এবং এরা ইঙ্গিত দেবে অদৃশ্য আইডিয়ার। এই ধারার অনুসরণে উনিশ শতকের শেষভাগে মালার্মে "বিশুদ্ধ কাব্যের" গবেষণা করেছেন। কিন্তু বোদলের-এর সঙ্গে তাঁর বিরাট পার্থক্য হল এই যে, বোদলের কখনো তাঁর মানুষী অবস্থাকে ভোলেননি বা ভুলতে পারেননি, আর মালার্মে নিজের অস্তিত্বকে মুছে দিয়ে নির্বিকল্প আইডিয়ার খোঁজে প্রাণপাত করেছেন। জীবনের অনুপস্থিতিই হয়েছে জীবন মালার্মের কাছে,

যেমন তিনি ফুলের ধারণা করেছেন "সমস্ত তোড়ার মধ্যে অনুপস্থিতি" দিয়ে অথবা ফলের অনুপস্থিতিতে তিনি "সমান আস্বাদ" পেয়েছেন ফলের। বস্তু-উপমার ওলট-পালট ঘটিয়ে তিনি বাস্তবকে ত্যাগ করেছেন এবং অন্তরাশ্রয়ী ঐক্য গড়তে চেয়েছেন। এক কৃত্রিম বাক্যমালা তৈরি করেছেন, যা হবে মন্ত্রোচ্চারণের মতো বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত, চোলাই ক'রে কাব্যকে ভাষার অর্থ-গ্রাহ্যতার বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। তাঁর জগৎ হয়েছে শব্দের স্ফটিকে নির্মিত শূন্যতার জগৎ। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিশুদ্ধ কাব্যসৃষ্টির প্রয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছে মস্তিষ্কের মরীয়া কসরত। বন্ধ্যাত্ব ছাড়া এর কোনো পরিণতি ছিল না। কবির নিজেরই চিঠিপত্রে ও কবিতায় তার পরোক্ষ স্বীকৃতি আছে এবং এক শিষ্যের কাছে তিনি বলেওছিলেন: "আমার আর্ট হল এক বন্ধ গলি।"

এই বন্ধ গলিপথে পরে পল ভালেরিও অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভালেরির বক্তব্য এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য আছে। অথবা বলা যায় ভালেরির কাব্যসৃষ্টিতে এক আত্মবিরোধিতা নিহিত আছে। সেই কারণেই বোধহয় গুরুর মতো তাঁর পরিণতি বন্ধ্যাত্বে নয়। যে-চেতনা জীবনকে অস্বীকার করে, তার শূন্য মার্গে "বিশুদ্ধ অবস্থান" কামনা করেছেন তিনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর আত্মা ও শরীরের মাধুর্যে আবিষ্ট থেকেছেন, "এই দুর্বোধ্য জীবন তাঁকে প্রলুব্ধ করেছে এবং সে-দুর্বলতায় তিনি আনন্দিত হয়েছেন যেন।" যে-"বিশুদ্ধ" মনোভাব ব্যক্তিসত্তা ও ঘটনাকে অতিক্রম ক'রে যায় তা মালার্মের মতো তাঁকে আকৃষ্ট করলেও বস্তু ও আবেগ তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে, যা মালার্মেকে ধরেনি। **La Jeune Parque** এবং **Le Cimetiere Marin**-তে মূলত এই দ্বন্দ্বই প্রকাশিত: একদিকে সেই চেতনা যা তার বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে সচেষ্ট; অন্যদিকে তার বিপরীত মনোভাব যা জীবনকে গ্রহণ করে, পরিবর্তন ও কর্মকে গ্রহণ করে এবং যা নির্বিকল্পের স্বপ্ন ত্যাগ ক'রে বস্তু দ্বারা বিমুগ্ধ হয় এবং তাদের রূপান্তরের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে। দুই কবিতারই সমাপ্তি জীবনের অনিবার্যতায়।

এই সব প্রচেষ্টা থেকে আর একটা বিষয়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হল কবি-কর্ম সম্বন্ধে কবির পূর্ণ সচেতনতা। বোদলের-এর উদ্যমেই এর প্রবর্তনা। **Les Fleurs du Mal** গ্রন্থের এক ভূমিকায় ভালেরি লিখেছেন: "কাব্যের মনের সঙ্গে সমালোচনার মনের সাক্ষাৎ এক অসাধারণ যোগাযোগ।" প্রেরণার

হাতে বোদলের আত্মসমর্পণ করতে চাননি। কল্পনা বলতে তিনি কাব্যসৃষ্টির সমস্ত উপায়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং সেগুলি আয়ত্ত করার ইচ্ছাকেও। আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যের পক্ষে স্রষ্টার এই দায়িত্ব গ্রহণ এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শিল্পী বা সাহিত্যিক তার সৃষ্টির উপায় সম্বন্ধে ক্রমশই বেশি সচেতন। এই মনোভাব তখন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সমস্ত কাব্যস্রষ্টার মধ্যেই দেখা গেল।

বোদলের-এর হাতে কাব্য ও গদ্যের মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপনও পরবর্তী কালে অনেক দুঃসাহসিক যাত্রার প্রেরণা জুগিয়েছে, র‍্যাবো লোত্রেয়াম থেকে স্যুররেয়ালিস্ট পর্যন্ত। বোদলের একদিকে যেমন প্রথাগত পদ্যে কাব্য লিখলেন, অন্যদিকে তেমন কাব্যকে মাত্রা ও মিলের বন্ধন থেকে ছিন্ন ক'রে নিয়ে এলেন গদ্যের কাঠামোয়। তাঁর আগে অবশ্য কয়েক জন রোমান্টিক এ-চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু বোদলের-এর **Poemes en Prose**-এ তার প্রথম সচেতন সংগঠিত রূপ। কাব্য ও গদ্যের মধ্যে এই পৃথকীকরণ আধুনিক সাহিত্যের এক প্রধান ঘটনা। এ যেন লিরিক আচরণের উপর এক সজাগ সমালোচক মনের খবরদারি, রোমান্টিক উর্ধ্ববিহারে বুদ্ধির হস্তক্ষেপ, পৃথিবীর মাটিতে তাকে ছুঁইয়ে রাখার চেষ্টা।

ভিতরে বাইরে কাব্যকে মুক্ত ক'রে দেবার প্রয়াসে এরপর যে-নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সে হল গীয়োম আপলিনের। বিশ শতকের প্রথমে আপলিনেরকে আশ্রয় ক'রে কাব্য যত বিভিন্ন ধারায় প্রসারিত হবার চেষ্টা করেছে এমন আর কখনো করেনি। বোদলের-এর চেয়ে কলাকৌশলে বেশি পারদর্শী, সবকিছু সম্বন্ধে বোদলের-এর চেয়ে বেশি কৌতূহলী আপলিনের কাব্যে সব বস্তুকে এবং সব পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর কাব্যের বাহন সনাতনী ছন্দ থেকে আরম্ভ ক'রে **Vers libre** * ও গদ্য পর্যন্ত। আপলিনের-কাব্যের উপাদানটাই যতদূর সম্ভব সমৃদ্ধ, বিচিত্র ও নমনীয়। সবরকম বস্তু, সবরকম অনুভূতি ও সবরকম মনোভাব দিয়ে তা গড়া। ইতিহাস, গল্প, জনশ্রুতি, রেস্তোরাঁর কোনো আলাপ, গানের কোনো ধুয়া, কোনো উদ্ধৃতি, কোনো স্মৃতি—এইসব নিয়ে তাঁর কবিতার রচনা। অতি দৈনন্দিন, অতি গদ্যময় বিষয়কে কবিতায় রূপান্তরিত করতে যে-ক্ষমতার দরকার সে-ক্ষমতা তাঁর ছিল।

---

* সিম্‌বলিস্ট আমলের মুক্তিপ্রয়াসী কোন্ কবিকর্মী এর জনক? ঝ্যুল লাফর্গ, না গ্যুস্তাভ কান্?

আপলিনের এত বিভিন্ন প্রবণতার কেন্দ্র যে তাঁকে এক কথায় ব্যাখ্যা করতে যাওয়া ঠিক নয়। শুধু এই বলা যায় যে, জীবন তাঁকে যা কিছু এনে দিয়েছে তা দিয়েই তিনি তাঁর কাব্যজগৎ গড়েছেন। কামানের গোলাবর্ষণের রাতকে তিনি বানিয়েছেন উৎসবের রাত, ছুটন্ত গোলায় দেখেছেন "চাঁদের রং" আর টের পেয়েছেন "রাত্রির কোমল সৌরভের" প্রতি আদর। গোড়া থেকেই তিনি "পদ্য লেখার পুরোনো খেলা" মানতে চাননি। পরে রোমান্টিসিজ্‌ম্ ও সিম্‌বলিজ্‌ম্-এর উত্তরাধিকারকে তাঁর মনে হয়েছে শৃঙ্খল। যে-সাহিত্য তাঁকে তাঁর যুগের অভিনব উদ্দীপ্ত জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে বাধা দিয়েছে, তাকে বর্জন করতে তিনি দ্বিধা করেননি। Zone (Alcools গ্রন্থে) কবিতার প্রথম অংশ এই মুক্তি-প্রচেষ্টার সাক্ষ্য। বাক্যের অ্যালকেমির কাছে আর তিনি মিরাকল্‌ প্রত্যাশা করেন না, শব্দের সঙ্গীত তাঁর কাছে অবজ্ঞেয়। বস্তু থেকেই, ঘটনা থেকেই অতঃপর উৎসারিত হবে আশ্চর্য।

কাব্য ও কাব্যবস্তুর মধ্যে বিচ্ছেদ দূর ক'রেও আপলিনের শেষ পর্যন্ত কবিতাই লিখলেন, যার উপরে পূর্বগামীদের কিছু কিছু প্রভাবও লক্ষ্য করা গেল, এবং ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর গুরুত্ব বোধহয় কাব্যস্রষ্টার চেয়ে কাব্যপ্রবক্তা হিসেবেই বেশি। তাঁর প্রবর্তনাকে চরমে নিয়ে গেলেন স্যুররেয়ালিস্টরা (Surréalisme শব্দটি আপলিনেরই প্রথম ব্যবহার করেন)। তাঁরা অবচেতনকে বললেন কাব্যের উৎস, বললেন ওখানেই কাব্যের মুক্তি। তাঁদের বক্তব্য অনেকটা এই রকম: সব বস্তুর মধ্যেই কাব্য নিহিত, কিন্তু প্রথম প্রয়োজন হল লেখকের কাব্যিক অবস্থা সৃষ্টি করা, যা এই বস্তুনিহিত কাব্যকে উৎসারিত করতে পারবে, সেজন্যে মনের উপর থেকে যুক্তির শাসন সরিয়ে দিতে হবে, তাহলে নিজের গভীর সত্তার সন্ধান পাওয়া যাবে এবং অবচেতনের সম্পদ তার অধিগত হবে। অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্জগতের পার্থক্য নেই; বহির্জগতের যুক্তিনিয়ম বাস্তবের উপর চাপিয়ে দেওয়াটা এক স্বৈরাচারী সনাতনী ব্যবস্থা। শিল্পী বিশেষত কবির কাজ হল পৃথিবীর বিশৃঙ্খলাকে প্রকাশ করা, যাকে বাস্তব বলা হয় তার "সম্পূর্ণ অপহ্নব ঘটানোয় সাহায্য করা।" নতুন রচনা-পদ্ধতি écriture automatique (স্বয়ংক্রিয় লিখন) হল আমাদের বুদ্ধির লজিক-মুক্ত মনোজীবনের গতিকে ধরার এক উপায়, এবং তার দ্বারা আমরা দেখতেও পাব যে, এই গতি আর বাইরের পৃথিবীর বস্তুরূপ এক; মানুষ যদি স্বপ্নকেও তার প্রাথমিক অবস্থায় ধরতে পারে

তাহলে বুদ্ধিগত জীবনে তার অবিকল প্রতিরূপ পাওয়া যাবে। আন্দোলনের প্রধান নেতা আঁদ্রে ব্রতঁ তাঁর ইস্তাহারে বললেন : "আমি বিশ্বাস করি যে, বাহ্যত বিরোধী এই দুই দশা অর্থাৎ স্বপ্ন এবং বাস্তব অপসৃত হয়ে তাদের থেকে উদ্ভূত হবে এক নতুন ধরনের বাস্তব, এব Surre'alite'।" প্রকৃতপক্ষে এ-দৃষ্টি র‍্যাঁবোর নির্দেশেরই পরিণতি : de'reglement de tous les sens।

এ থেকে মানুষের এক নতুন সংজ্ঞাও এল : সে তার সনাতনী প্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ নয়, মনের গভীরতম স্তরে নিহিত বিচিত্র গুণে সমৃদ্ধ। শিল্প কোনো নির্বাচিত উজ্জ্বলতম মুহূর্তের অনড় প্রতিরূপ নয়, কাব্যের লক্ষ্য হল মনের প্রবাহকে তার গতিশীলতায়, তার পলায়নপরতায়, তার অনুষঙ্গ ও চিত্রকল্পের খেলায়, তার বিনিময় ও রূপান্তরের ক্রিয়ায় উদ্‌ঘাটন করা। এই নতুন রূপ ও নতুন ঐক্যের সন্ধান দেখা সজ্ঞবদ্ধভাবেই দেখা গেল আপলিনের-এর পরবর্তী কবিদের মধ্যে। আঁদ্রে ব্রতঁ, পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ, ত্রিস্তাঁ ৎজারা প্রমুখের তখনকার রচনা তার উদাহরণ।

এই শতাব্দীর তিশ দশকের স্যুররেয়ালিস্ট আন্দোলনে অতীতের ধারা খুঁজে পাওয়া যায়। বোদলের ও র‍্যাঁবোর চিন্তা এইদিকে ইঙ্গিত করেছে, নেরভালের রচনাতেও আভাস আছে। তারও আগে রোমান্টিক আন্দোলনেই এর বীজ বোনা হয়েছিল। কিন্তু আগেকার সব চেষ্টার সঙ্গে স্যুররেয়ালিজ্‌ম্‌-এর তফাৎ হল এই যে, আগের আমলে যুক্তিকে বাদ দিতে গিয়েও যুক্তির সঙ্গে রফা করা হচ্ছে, কিন্তু স্যুররেয়ালিজ্‌ম্‌ কাব্য থেকে বহিষ্কৃত করল যুক্তি-জড়িত সমস্ত উপাদান। বিস্তৃত চিত্রকল্পই হল "স্বয়ংক্রিয় লিখনের" আশ্রয়। কিন্তু স্যুররেয়ালিজ্‌ম্‌-এর অবস্থান আরো ব্যাপক তাৎপর্যের পটভূমিতে। তার প্রভাব ও তার ভাঙন দুয়েরই মূল সেইখানে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট দাসত্ব হল চিন্তার দাসত্ব, যা পৃথিবী সম্বন্ধে ভুল ধারণা দেয় এবং মানুষকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দেয় না—এই কথা ব'লে কাব্যের মুক্তির সঙ্গে মানুষের মুক্তির প্রশ্নকে জড়িয়েছে এই আন্দোলন। নিষেধ ও প্রতিবন্ধ এবং অবিচারে গড়া সমাজের বিরুদ্ধে সে ক্ষুব্ধ। যে-জগৎ মানুষের শুধু যুক্তিবাদী অস্তিত্ব অর্থাৎ খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা তথা দাসত্ব ছাড়া আর কিছু রাখে না, সে-জগতের প্রতি তার ঐকান্তিক ঘৃণা। মানুষ ও সমাজের অবস্থা বর্জন করার ফলে স্যুররেয়ালিজ্‌ম্‌-এর সংগঠন বিদ্রোহে। পার্থিব অস্তিত্বের বাইরে অন্য অস্তিত্বকেও সে অস্বীকার করেছে। এই ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই পরে ব্রতঁর সঙ্গীদের কেউ কেউ সমাজ-ব্যবস্থা বদলের

জন্যে রাজনীতিক তৎপরতাকে মুখ্য ব'লে মানলেন, এবং এই পথেই স্যুররেয়ালিজ্‌ম্‌-এর উপর এসে পড়ল বস্তুবাদী মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এর ধাক্কা, আরাগঁ, এলুয়ার, ৎজারা প্রভৃতির পরিণতিতে যার পরিচয়।

এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। ফ্রান্সের সাহিত্যক্ষেত্রে যে-সব প্রধান লেখক আজ প্রগতিশীল ব'লে অভিহিত, তাঁরা সাহিত্যিক বিবর্তনের ধারাতেই প্রগতির ভূমিতে এসে পৌঁছেছেন। তাঁদের সাহিত্য-দৃষ্টি ক্রমে সমাজ-দৃষ্টির সঙ্গে একটা ঐক্য সাধন করেছে। উনিশ শতকের শেষে **Humaniste** বা **Naturiste** আন্দোলন সমাজ-প্রগতির কথা সামনে ধরেছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে কোনো বড় শিল্পীর উদ্ভব হয়নি, অপেক্ষা করতে হয়েছে সিম্‌বলিজ্‌ম্‌ ও তার পরবর্তী স্যুররেয়ালিজ্‌ম্‌-এর স্বাভাবিক সাহিত্যিক বিবর্তনের জন্যে। অন্য কথায় বলা যায়, ক্ষমতাবান শিল্পীরা ঐতিহ্যগত সাহিত্যিক ধারাকে অবলম্বন ক'রেই অগ্রসর হয়ে এসেছেন, হঠাৎ বাইরে থেকে এসে বড় হয়ে ওঠেননি।

ফ্রান্সের আধুনিক কাব্য ঐতিহাসিক পরম্পরারই পরিণতি। বোদলের থেকে আরম্ভ ক'রে বহু কবির সৃষ্টি ও চিন্তা থেকে তার উদ্ভব। নিজের সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা এর ভিত, এবং এর পরিধির সীমা নেই। এখনকার কাব্য নিছক কবিতা ছাড়া আর কিছু হতে চায়, হতে চায় জীবন রূপান্তরের প্রকাশ। এ অবশ্য স্যুররেয়ালিজম্‌-এর উত্তরাধিকার। এ থেকে ভাষা সম্বন্ধে এক অসহিষ্ণুতাও লক্ষণীয়। কিন্তু শব্দের প্রতি স্যুররেয়ালিজম্‌ যে-অবজ্ঞা সঞ্চার করেছিল এবং কাব্যকে জীবনের সঙ্গে একাকার ক'রে যে-অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছিল তার বিরুদ্ধে প্রশ্নও এখন জাগ্রত। কাব্যের অস্তিত্বের পক্ষে শব্দ প্রয়োজন, এক সংগঠিত শব্দসমন্বয় প্রয়োজন এবং কিছু নিয়ম মেনে তাকে চলতেই হবে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুতে কাব্য থাকতে পারে, কিন্তু কবি হলেন তিনি যিনি শিল্পের নিজস্ব অন্তর্নিহিত নিয়ম অনুসারে বাক্যের সাহায্যে বস্তুকে স্পর্শ করবার মতো এক অবস্থায় নিয়ে আসবেন, যিনি পৃথিবীর বস্তু ও প্রাণীতে ছড়ানো কাব্যকে আহরণের পর তাকে কবিতায় ধ'রে অন্যদের "পড়তে দেবেন" (এলুয়ার-এর ভাষা)।

অতি-আধুনিক ফরাসী কাব্যের চারিত্র্যকে একটা খাতে ফেলা সম্ভব নয়। তবু হয়তো বলা চলে সে আজ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধ ফরাসী কাব্যে তেমন কিছু ছাপ রাখেনি, কিন্তু আজ স্যুপেরভিয়েল, ঝুভ,

এলুয়ার, আরাগঁ, ৎজারা, প্রেভের, শার প্রমুখ প্রায় সমস্ত প্রধান কবির কাব্যেই যুদ্ধের স্পর্শ। অবশ্য তার প্রকাশ বিভিন্ন ভাবে, কিন্তু তা রয়েছে। বাস্তবের অনুলিপি নয়, বাস্তবের সাক্ষ্য, এই এখনকার মূল কথা। বহুরকম পলায়ন, বহুরকম আত্মগোপনের পর কবিতা এখন সকলের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। এ জন্যে কেউ কেউ ফর্মের অভিনবত্ব বর্জন ক'রে প্রথাগত পদ্ধতি অবলম্বন করতেও ইতস্তত করছেন না। বোধগম্যতার প্রশ্ন এখন ফরাসী কবিদের সামনে খুব বড় প্রশ্ন। আধুনিক ফরাসী প্রাবন্ধিকের ভাষায়: আমি থেকে আমরায় যাওয়া। কিন্তু এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর কি কখনো পাওয়া যাবে?

১৯৫১

আধুনিক ফরাসী কবিদের কথা

১.

কয়েক বছর আগে একজন ইংরেজ লেখক সখেদে প্রশ্ন করেছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডে কোনো সার্থক কবির উদ্ভব হল না কেন যেমন হল ফ্রান্সে। তিনি নাম করেছিলেন, আরাগঁ এবং এলুয়ার-এর। গত একশো বছর ধ'রে ফরাসী কাব্য-জগতে যা ঘটেছে, তা থেকেই এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। যুদ্ধ আর পরাধীনতার ট্র্যাজিডির পটভূমিতে সমসাময়িক ফরাসী কবিদের সাফল্য পূর্ব প্রয়াসের সঙ্গে সম্পর্কিত। সে-সাফল্য ভুঁইফোঁড় নয়; তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের পূর্বগামীদের ইতিহাস রয়েছে তার পেছনে।

দুঃসাহসী যাত্রার পথে এগিয়ে যাবার এক মনোভাবে বর্তমান ফরাসী কাব্য অনুপ্রাণিত। তার বৈচিত্র্য ও প্রাণশক্তির মূল সেইখানে। আজকের কবিরা এই মনোভাব উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছেন তাঁদের অগ্রজদের কাছে থেকে। বোদলেয়, ভের্লেন, মালার্মে, করবিয়ের, লোত্রেয়াম, র‍্যাঁবো, লাফর্গ, ঝারি, আপলিনের এবং আরও কতজন, যেন একজনের পর একজন অভিযাত্রী নতুন নতুন পথে পৃথিবী আর জীবনকে আবিষ্কার করতে বেরিয়েছেন। কাব্য আর শুধু রসাত্মক বাক্য থাকেনি, বাঁচবার একটা পদ্ধতি হয়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেকাদাঁ-স্যাবলিস্ত্‌ আমলে এবং তারপর আমাদের এই শতাব্দীতে যে-কবিরা প্যারিসের কাফে কাবারেতে অদ্ভুত আচরণ ক'রে লোককে তাজ্জব বানিয়েছেন এবং যথেষ্ট বিদ্রূপও শুনেছেন, তাঁরা তার দ্বারা একটা বিশেষ মনোভাবই প্রকাশ করেছেন: নিছক অভ্যাসের বশে অনুসৃত জীবনযাত্রার ছকের প্রতি অবজ্ঞা এবং বিদ্রোহ। পূর্বগামী কবি-প্রধানদের উদ্যম বিভিন্ন প্রকৃতির। বোদলেয়-এর কাব্য-চেতনার কেন্দ্রে এসে দাঁড়াল শহুরে মানুষ তার যন্ত্রণা অসুস্থতা ও জটিল অন্তর্বিরোধী ব্যক্তিত্ব নিয়ে, আধুনিক জীবনবোধের প্রবর্তন হল কাব্যে। লোত্রেয়াম মানুষ আর মানুষের স্রষ্টাকে আক্রমণ ক'রে লিখলেন "অবচেতনার বাইবেল," মনকে ছেড়ে দিলেন এক

নতুন পথে যেখানে অদ্ভুত অনুষঙ্গ থেকে সৃষ্টি হল এক নতুন সৌন্দর্যবোধ। র‍্যাঁবো চাইলেন জীবনকে পরিবর্তন করতে, সমস্ত প্রচলিত বোধকে উল্টে দিয়ে কবিকে দ্রষ্টা করতে। মালার্মের ধ্যান হল সৃষ্টির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছবার, পৃথিবীর অসম্বদ্ধতাকে কবিতার সম্বদ্ধতা দিয়ে অপসারিত করবার।

কবিদের এই যে দুর্গম যাত্রার সূত্রপাত হয়েছিল, তার না ছিল কোনো সীমা, না কোনো নির্দিষ্ট দিক। প্রেরণার উৎস এক হওয়া সত্ত্বেও পথ যে কত ভিন্ন হতে পারে, আমাদের শতাব্দীতে তার এক প্রধান দৃষ্টান্ত পল ক্লোদেল এবং স্যুররেয়ালিস্টদের আচরণ। র‍্যাঁবোর নাম ক'রেই একজন অঙ্গীকার করলেন খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রত্যয়কে আর অন্য পক্ষ অগ্রসর হলেন সমস্ত স্বীকৃত প্রত্যয়কে উচ্ছেদ করতে।

বর্তমান শতাব্দীতে স্যুররেয়ালিজ্‌ম্‌ ফরাসী কাব্যের এক বিরাট আন্দোলন। তার পূর্বগামী স্বল্পায়ু দাদাইজ্‌ম্‌ ছিল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের আন্দোলন, নেতিবাচক। সব ঠাট ভেঙে ফেলো, সব ভড়ং ভাব কেও বাদ দিয়ো না, সেও এক ভড়ং—এই রকম আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে দাদাইজ্‌ম্‌ আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে। তার অব্যবহিত পরেই আসে স্যুররিয়ালিজম্‌। ধ্বংসের ভূমিকা তার ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল নতুন মূল্য নিরূপণের উদ্যম। যুক্তির সমস্ত শৃঙ্খল ভেঙে মনকে অবাধে চলতে দিতে হবে, এক দিকে ছিল এই, অন্য দিকে শৈশব ও আদিম দৃষ্টির অন্বেষণ, আশ্চর্যকে উপলব্ধি করবার প্রয়াস। স্যুররেয়ালিজমের বাণী কাব্যের মুক্তি আন্দোলনে এক প্রবল প্রেরণা জুগিয়েছে। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের কাব্যক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মীও দেখা দিয়েছিলেন, যাঁরা স্বকীয় কীর্তির দৃষ্টান্ত ধরেন কনিষ্ঠদের সামনে। যেমন আপলিনের, যিনি কাব্য আর অকাব্যের সীমারেখা মুছে দিয়ে কবিতাকে সর্বগামী করেন। এই দৃশ্যপটের অপর প্রান্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভালেরি, তাঁর গতি অন্যদিকে। যুক্তি ও বুদ্ধি ছিল তাঁর ঘোষিত নীতি, স্যুররেয়ালিস্টদের বল্গাহীন কল্পনার বিপরীত। কিন্তু মজার কথা এই, তাঁর বুদ্ধির "কসরৎ' শেষ পর্যন্ত নিজেকে অতিক্রম ক'রে হয়ে দাঁড়াল এক নেশা।

ফ্রান্স ছাড়া বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোথাও কবি এবং কাব্য এমন তীব্রভাবে, এমন নিবিড়ভাবে বাঁচতে আরম্ভ করেনি, অন্য কোথাও একটার পর একটা সাহিত্য আন্দোলন এমন আত্মচেতনা নিয়ে দেখা দেয়নি। কবিদের মধ্যে ঐক্য এবং দায়িত্বের অংশগ্রহণ স্বভাবতই এসেছে এবং তারই স্বাভাবিক

প্রতিক্রিয়া হিসেবে এসেছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের মধ্যে সংঘর্ষ। আধুনিক ফরাসী কাব্যের বিবর্তনের ইতিহাসে সাহিত্যিক মতভেদের জন্যে ব্যক্তিগত বিরোধ ও সম্পর্কচ্ছেদের ঘটনা একাধিক ঘটেছে। কাব্যমতের সংঘাত দেখা দিলে ইংরেজ-সুলভ শহুবৎ ফরাসী কবিরা দেখাতে পারেনি।

২.

বর্তমান ফরাসী কাব্যে বিভিন্ন কবির উদ্যম এত ভিন্ন রকম যে তাদের পরিষ্কার শ্রেণী বিভাগ প্রায় অসম্ভব। গত যুদ্ধের সময় পরাধীনতার প্রশ্ন সব কিছু আচ্ছন্ন ক'রে ছিল। তখন প্রতিরোধ ছিল এক সাধারণ চিহ্ন যা দিয়ে এক সাধারণ শ্রেণী নির্ণয় করা চলত, আর ট্র্যাজিডির একই অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন কবির কণ্ঠ একই সুরে মিলত। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর চিন্তা ও প্রক্রিয়ার বিভিন্নতা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক, নানা কবির মধ্যে যত মিল ছিল, মূলত অমিল ছিল তার চেয়ে বেশি। প্রবীণ আরাগঁ এবং নবীন এমান্যুয়েল যতই প্রতিরোধে এক হোন, তাঁদের মধ্যে সত্যিকার আত্মীয়তা থাকার কথা নয়; কারণ মানবমুক্তির জন্যে আরাগঁ কামনা করেন সর্বহারা বিপ্লব আর এমান্যুয়েলের দৃষ্টি নিবদ্ধ মানব-পরিত্রাতা যীশু খৃস্টের দিকে। এমনকি যে ক্ষেত্রে চিন্তার পরিমণ্ডল এক, সেখানেও পদ্ধতি-প্রকরণ অত্যন্ত পৃথক, স্বরগ্রাম খুবই ভিন্ন। যেমন; পল ক্লোদেল (যিনি সম্প্রতি মারা গেছেন) এবং পিয়ের ঝাঁ ঝুভ। ধার্মিক ক্লোদেল তাঁর বিস্তৃত বাইবেলী গদ্য-ছন্দে এক বিশাল হার্মনি গ'ড়ে তোলেন এবং পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক সমগ্রতার অনুভব। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠস্বরের মিল কোথায় ধর্মবিশ্বাসী ঝুভ-এর, যিনি তাঁর নিরন্তর অনুভূত ভালোমন্দের সমস্যায় মিশিয়ে দেন মনস্তাত্ত্বিক ও যৌন-তাত্ত্বিক উপাদান এবং তাঁর প্রকাশভঙ্গিকে যেন অনেকটা ইচ্ছে ক'রেই জটিল করেন? যাঁদের কাছে শব্দই ব্রহ্ম, কবির একমাত্র ভাবনা, তাঁদের মধ্যেই বা কতখানি মিল? রবের গাঁজো অতি যত্নে সংগঠিত করেন এক একটি কবিতা, মালার্মের মতো তাঁর চেষ্টা শব্দের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আবিষ্কার করা; আর ঝাক অদিবের্তি শব্দ ছড়িয়ে দেন মুঠো মুঠো, যেন মুখরতা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই তাঁর।

ফ্রান্সের গত যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগ নতুন নতুন কবিকে লোকের সামনে তুলে

ধরেছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ লেখা আরম্ভ করেন স্যুররেয়ালিজ্‌ম্‌-এর অন্তিমকালে (১৯৩৪-১৯৩৮), কেউ কেউ আরও পরে। তাঁরা নিশ্চিত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এবং স্বীকৃতিও লাভ করেছেন, যদিও কোনো কোনো কবি আশাভঙ্গও ঘটিয়েছেন। এই সব কবির মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা গেল, এঁদের জন্মকাল ১৯০৯ থেকে ১৯২৪-এর মধ্যে: গিলেভিক, আঁদ্রে ফ্রেনো, ল্যুসিয়ঁ্যা বেকের, ঝাঁ রুসলো, এমে সেজের (নিগ্রো কবি), ঝাঁ কেরল, পাত্রিস দ্য লা তুর দ্যু প্যাঁ, পিয়ের এমান্যুয়েল, আঁরি পিশেৎ। বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্নভাবে তাঁদের শ্রেণী বিভাগ এবং নামকরণ করেন, যথা অধ্যাত্মবাদী, আলঙ্কারিক, বিদ্রোহী, গীতিধর্মী, বাস্তববাদী, মানবতা-বাদী, বস্তুতন্ত্রী ইত্যাদি। এ থেকে আর কিছু না হোক, আধুনিক ফরাসী কাব্যের বৈচিত্র্য অনুমান করা যায়।

সমসাময়িকদের মধ্যে অনেক প্রধান কবি কোনো না কোনোভাবে স্যুররেয়ালিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্যুররেয়ালিজ্‌মের 'সরকারী' নেতা আঁদ্রে ব্রাতঁ ছাড়া আর সকলেই ঐ আন্দোলন থেকে স'রে এসেছেন অনেককাল আগে। এই কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন লুই আরাগঁ। তাঁর কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণই স্যুররেয়ালিস্ট আন্দোলনের প্রথম বড় ভাঙন। কবি হিসেবে আরাগঁ গত যুদ্ধের সময়ই গৌরবের উচ্চতম শিখরে ওঠেন। সনাতন কাব্যরীতিকে নতুনভাবে এবং আশ্চর্যভাবে ব্যবহার ক'রে তিনি এক বলিষ্ঠ উচ্ছ্বসিত গীতিময়তা সৃষ্টি করেন, যা পরাধীন জাতির আশা, ভালোবাসা, ঘৃণা ও ক্রোধকে অনবদ্য ভাষা দেয়। আরাগঁর যুদ্ধকালীন জনপ্রিয়তা যদিও কমেছে, তবু তাঁর প্রতিভা সন্দেহাতীত। কি গদ্যে কি পদ্যে তাঁর শিল্প-নৈপুণ্য সর্বজনস্বীকৃত। আরাগঁর পাশাপাশি একই সাহিত্যিক বিবর্তনের পটভূমিতে উঠে আসে আর একটি নাম: পল এল্যুয়ার। তিনি আর বেঁচে নেই, কিন্তু সমসাময়িক কাব্যে তাঁর কীর্তি এখনো জীবন্ত। আধুনিক কালের মহৎ কবিদের তিনি অন্যতম। চিত্রকল্পের স্বকীয়তায় ও সমৃদ্ধতায়, অনুভবের ঘনিষ্ঠতায়, প্রেমের অকৃত্রিম মানবিক ব্যঞ্জনায় তাঁর কাব্যের তুলনা বিরল। এঁদের সমকালীন আর একজন বড় কবি হলেন ত্রিস্তঁ্যা ৎজারা। দাদাইজ্‌ম্‌ প্রতিষ্ঠা করেন ৎজারা, কিন্তু তাকে বর্জন ক'রে চ'লে আসেন স্যুররেয়ালিজ্‌মে, সেখান থেকে এগিয়ে হিউম্যানিটেরিয়ানিজ্‌মে। ৎজারা নিজেই বলেন, তিনি এখন মানবতাবাদী। এককালে ধ্বংস ছিল তাঁর

মূলমন্ত্র, তাঁর এলোমেলো বাক্যের স্রোতে এক মারমুখো তীব্রতা ছিল। এখন সেই বাক্যপ্রবাহ অনেকটা সুসম্বদ্ধ। পূর্ণতর অস্তিত্বের জন্যে মানুষের প্রয়াস এবং মনোজগতের অন্তহীন আন্দোলন, এ-দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধনে তাঁর কাব্য ব্যাপৃত।

প্রাক্তন স্যুররেয়ালিস্টদের বয়োজ্যেষ্ঠ ঝ্যুল স্যুপেরভিয়েল এবং পিয়ের র‍্যভেরদি বরাবর তাদের আন্দোলন থেকে তফাৎ ছিলেন। সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকেই এঁরা দুজনে প্রতিভাশালী কবিরূপে স্বীকৃতি পান এবং দুজনেই পরবর্তী জীবনে সে স্বীকৃতিকে বজায় রাখেন। স্যুপেরভিয়েল তো এখন মহৎদের মধ্যে একজন।

বিশ্বজগৎকে যে-দৃষ্টিতে স্যুপেরভিয়েল দেখেন, তার কাছে পর বা দূর ব'লে কিছু নেই। পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান, তার সঙ্গে এক অপূর্ব ঘনিষ্ঠতা তাঁর—মানুষ, পশু গাছপালা, পাথর সব কিছুর সঙ্গে। এর মূলে জীবনের প্রতি এক নিবিড় প্রেম। অনেকখানি পথ চ'লে আসার পর এই ভাঙাচোরা ক্ষয়িষ্ণু জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে তার সৌন্দর্যকে তিনি এইভাবে উপলব্ধি করেন:

এই তো সুন্দর এই যে দেখেছি
পত্রগুচ্ছের নিচে ছায়া
এই যে অনুভব করেছি
বয়স নগ্নদেহের উপর সঞ্চরমান
আমাদের ধমনীর কালো রক্তের
বেদনার সঙ্গী হয়েছি
আর তার নীরবতাকে সাজিয়েছি
সহিষ্ণুতার তারায়...
এই যে অনুভব করেছি
ত্রস্তব্যস্ত হেলাফেলা ক'রে ভালবাসা জীবনকে
এই যে তাকে ধ'রে রেখেছি
এই কবিতার মধ্যে।

সমস্ত বস্তুর নিরবচ্ছিন্নতা, সব কিছুর প্রাণ তাঁর কাব্যে প্রতিধ্বনি তোলে:

হোমারের কাল থেকে সমুদ্রের এক ঢেউ
মনোরম উপকূল খুঁজে ফেরে যাতে তিন
সহস্র বছর মর্মরিত হয়ে ওঠে।

কিংবা

এই গাছ এত কাছাকাছি, ওর মিল
সেই সব অপূর্ব স্মৃতির সঙ্গে যারা তাদেরই
ভস্মের মধ্যে নড়ে।

কিংবা

সৃষ্টির সব কম্পমান পশু
আমার ধমনীর সঙ্কীর্ণ খালের মধ্যে বেঁচে।

স্যুপেরভিয়েল নিজে বলেছেন, "আমি অনুভব করি একই সময়ে আমি সর্বত্র উপস্থিত আছি, যেমন স্থানের মধ্যে তেমন হৃদয় ও চিন্তার বিভিন্ন এলাকায়।" এ অনুভূতি তাঁর কাব্যে স্পষ্ট। প্রত্যক্ষ যা নয় তার উপস্থিতি তাঁর কাছে প্রত্যক্ষের মতোই সত্য। তাই মৃত্যুও তাঁর কাছে মৃত নয়:

যা কিছু পৃথিবীতে ম'রে গেছে
দূর থেকে নিশ্বাসে জীবন টেনে ফেরে
যে অন্ধকারে বিস্মৃতি বেড়ে ওঠে
তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেরে।

স্যুপেরভিয়েল-এর জগতের কেন্দ্রে কিন্তু সেই মানুষ যার সঙ্গে সংযোগেই সব কিছু অর্থময়। মানুষের দৃষ্টি, মানুষের মনোযোগ যখন নিবদ্ধ হবে না তখনই সব কিছুর বিলোপ:

নক্ষত্র বলে মনে মনে, "আমি এক সুতোর
ডগায় কাঁপছি
যদি কেউ আমার কথা না ভাবে তাহলে আমি
আর থাকি না।"

অথবা

যখন কেউ তার দিকে তাকায় না
তখন সমুদ্র আর সমুদ্র নয়
সে হয়ে যায় আমাদের মতো
যখন কেউ আমাদের দেখে না।

বিলুপ্তি, নিঃসঙ্গতা ও যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে স্যুপেরভিয়েল-এর কাব্য সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর এক বিশাল জীবনকাহিনী। যুক্তি বা মতবাদ দিয়ে সংগঠন

ক'রে নয়, আত্মীয়তার অনুভব ক'রে। তাঁর কাছে মানুষের দায়িত্ব তাই স্বতস্ফূর্ত :

পৃথিবীর ভার বহন করা কী কঠিন !
লোকে বলবে
প্রত্যেক মানুষের পিঠেই তার ভার রয়েছে।
কিন্তু তাকে আর একটু দূরে তো ব'য়ে নিয়ে
যেতে হবে সব সময়
যাতে আজ থেকে আগামীকালে সে উত্তীর্ণ
হয়।

পিয়ের র‍্যভেরদির কবিতা অন্য জাতের। তিনি এক নতুন প্রকাশরীতি প্রবর্তন করেন ব'লে একদা তাঁকে স্যুররেয়ালিস্টরা 'গুরু' ব'লে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। যৌবনে তিনি পিকাসো প্রমুখ চিত্রকরদের সাহচর্যে কিউবিস্ট আন্দোলনে জড়িত ছিলেন (আপলিনের ও মাক্স ঝাকব ছিলেন তাঁর সঙ্গে)। তখন তাঁর কবিতা কিউবিস্ট নামে অভিহিত হয়েছিল, এখনো হয়। কারণ বোধহয় এই যে, তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা কিউবিস্ট চিত্রসুলভ এক নিশ্চলতা ও সমরূপতা স্মরণ করিয়ে দেয়। র‍্যভেরদি তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন, কবিতা হল "সেই ফটিক-দানা (crystal) যা বাস্তবের সঙ্গে মনের উথল সংস্পর্শে জমাট বাঁধে।" এ-সংজ্ঞা তাঁর কবিতা সম্বন্ধেই সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। তাঁর মনের ওঠাপড়াকে বাইরের বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করার সূক্ষ্ম চেষ্টা থেকে যে-সব কবিতার জন্ম হয় তারা স্বচ্ছ ফটিক-দানার মতো, সেখানে বিলীয়মান মুহূর্তের রহস্য যেন কেন্দ্রীভূত হয় এবং তারা প্রধানত একটা উদ্বেগের অনুভূতি বিকীর্ণ করে। যে-উদ্বেগ আমাদের সময়ের উপর চেপে আছে তারই বিকিরণ ? হয়তো তাই। একটি ছোট কবিতা শুনুন :

সব নিবে গেছে
হাওয়া মর্মর শব্দে বইছে
আর গাছগুলো শিউরে উঠছে
জন্তুরা ম'রে গেছে
কেউ আর নেই

দ্যাখো

তারারা আর জ্বলছে না

পৃথিবী আর ঘুরছে না

একটা মাথা ঝুঁকে পড়েছে

তার চুল রাতের উপর দিয়ে ছড়িয়ে আছে

শেষ গির্জাচুড়া দাঁড়িয়ে

রাত বারোটা বাজল।

র‍্যাভেরদির কবিতায় মুখরতা এবং চমকপ্রদ চিত্রকল্প একেবারে অনুপস্থিত। তিনি যে-সব শব্দ ও চিত্রকল্প ব্যবহার করেন, তা সহজ সাধারণ, এমনকি অনেক সময় অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তাতে তাঁর বাক্য দুর্বল হয় না, বরং তাঁর কণ্ঠস্বরের অকৃত্রিমতাই জোর পায়।

গ্যপেরভিয়েল ও র‍্যাভেরদি প্রাচীন কবিদের দলে। এঁদের প্রায় সমসাময়িক আরো কয়েকজন আছেন, যাঁরা আধুনিক ফরাসী কাব্যে কিছু কিছু নিজস্ব সুর এনেছেন, যেমন স্যাঁ-ঝন পের্স এবং ঝাঁ ককতো। প্রাচীনদের উল্লেখে আর এক-জনের নাম স্মরণীয়। তিনি হলেন ব্লেজ সাঁদ্রার। আধুনিক যন্ত্রযুগের গান গেয়েছেন সাঁদ্রার তাঁর প্রবলকণ্ঠ কাব্যে। ভবঘুরের মতো পৃথিবীর নানা দেশে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং তাঁর পক্ষে সহজলভ্য উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে বলেছেন, "এই যে রয়েছি এইটাই তো এক সত্যিকার সুখ" এবং "আমরা বিষণ্ণ হতে চাই না।" কিন্তু বর্তমানের উল্লাসকে আঁকড়ে ধরা সত্ত্বেও সাঁদ্রার শেষ পর্যন্ত ক্লান্তি ও সন্দেহকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি, লিখেছেন :

প্রভু, আমি ফিরেছি ক্লান্ত, একলা আর

খুব বিষণ্ণ

আমার শয্যা কবরের মতো নিরাবরণ

প্রভু, আমি একেবারে একা, আমার জ্বর এসেছে

আমার শয্যা শবাধারের মতো ঠাণ্ডা

প্রভু, আমি চোখ বন্ধ করেছি, আমার দাঁত

ঠকঠক করছে

আমি অত্যন্ত একা, আমার শীত করছে,

আমি তোমাকে ডাকছি

লক্ষ লাটিম ঘুরছে আমার চোখের সামনে
না, লক্ষ মেয়ে ; না, লক্ষ বেহালা
প্রভু, আমি ভাবছি আমার দুঃখের
মুহূর্তগুলোর কথা······
আমি তোমার কথা আর ভাবছি না, আমি
তোমার কথা আর ভাবছি না।

একটা জিনিস উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক কালে ফ্রান্সে যে-কবিরা সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, তাঁরা কেউ তরুণ নন। কারো বয়স ৪৭-এর নিচে নয়। গত মহাযুদ্ধের পরেই তাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন, যদিও লিখছেন অনেক দিন থেকে। তাঁদের মধ্যে দু'জন হলেন রেমঁ ক্যনো ও ফ্রাঁসিস পঁঝ। ক্যনোর বিস্ময়কর বাকচাতুর্য সব কিছুকেই উপহাস্য ক'রে তোলে, এমনকি কবিতা লেখাকেও। মনে হয়, তাঁর ব্যঙ্গ যেন মানুষের যা কিছু প্রিয় তাকে নস্যাৎ করতে চায়, নিজের সত্তাও তা থেকে বাদ যায় না। তার ফলে ক্যনোর কাব্য পাঠকের মনে এক গভীর অস্বস্তি জাগায়, মানুষের এক অর্থহীন অবস্থার ছাপ পাঠকের মনে রেখে যায়।

ফ্রাঁসিস পঁঝ্‌-এর জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি চিত্রকরদের মতো স্টিল লাইফের ছবি আঁকেন। পাথরের নুড়ি, কমলালেবু, শামুক, ঝিনুক, রুটি, এইসব হল তাঁর রচনার বিষয়। সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে তিনি বহির্বস্তুর বর্ণনা করেন, লেখকের ব্যক্তিগত আবেগকে তার কাছে ভিড়তে দেন না। কিন্তু তাঁর প্রক্রিয়া কবি এবং বর্ণিত বস্তুর মধ্যে একটা একাত্মতা নিয়ে আসে, যার ফলে কবিতা সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে দু'পক্ষেরই যেন এক নতুন অস্তিত্ব শুরু হয়, কবিতা লেখা হওয়ার আগে ঠিক যেরকমটা ছিল না। পঁঝ্‌ একে বলেন সহ-জন্ম (co-naissance)। তাঁর কবিতার বাহন হল গদ্য, স্বচ্ছন্দ নমনীয় ফরাসী গদ্য। তার সাহায্যে তিনি মানুষ আর দৃশ্যবস্তুর মধ্যে এক অলক্ষ্য সহানুভূতির বন্ধন গ'ড়ে তোলেন। মানুষের কথা পঁঝ-এর কাব্যে এই ভাবে আসে। প্রকৃতির সংজ্ঞা দিয়ে মানুষ নিজেকে আবার বুঝবে, এই যেন তাঁর কামনা।

কিন্তু বর্তমান ফরাসী কাব্যে এঁদের চেয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অন্য তিনজন কবি, যারা গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রধান লেখক ব'লে স্বীকৃত হয়ে-

ছেন। তাঁরা হলেন ঝাক প্রেভের, আঁরি মিশো এবং র‍্যনে শার। গত যুদ্ধের আগে পর্যন্ত তাঁরা অল্পবিস্তর উপেক্ষিতই ছিলেন।

এই তিনজনের মধ্যে প্রেভের এক বিশেষ কৌতূহল জাগ্রত করেছেন, যার জন্যে ফরাসীরা বলে **le cas Prevert**। তিনি কাব্যকে নিয়ে গেছেন জনসাধারণের কাছে। যে-সময়ে আধুনিক কাব্য 'বিশেষজ্ঞ' মনের সংরক্ষিত এলাকা ব'লে বিবেচিত হচ্ছিল এবং জনসাধারণ সসম্ভ্রমে দূরে স'রে ছিল, তখন প্রেভের তার প্রবেশদ্বার খুলে দিয়েছেন সকলের কাছে। সবচেয়ে আশ্চর্য এই, তিনি এ-কাণ্ড ঘটিয়েছেন তুচ্ছতা এবং স্থূলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, আধুনিক কাব্যের জটিল উদ্ভাবনাকে অস্বীকার না ক'রে। এই হল প্রেভের-রহস্য, **le cas Prevert**। প্রেভের-এর বইয়ের বিক্রি ঔপন্যাসিকদের ঈর্ষার বিষয়; তাঁর প্রথম বই Paroles এখন হাজার পঞ্চাশেক বিক্রি হয়েছে। কেন তাঁর এই জনপ্রিয়তা? এ-প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে প্রেভের আসলে প্রথম শ্রেণীর কবি ন'ন বলেই এত জনপ্রিয়। কিন্তু শ্রেণী-নির্ণয়ের কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, প্রেভের অগ্রাহ্য করবার মতো কবি ন'ন এবং সেইজন্যেই তাঁকে নিয়ে এত মাথা ঘামানো। প্রেভের-এর অসাধারণ জনপ্রিয়তা কেন, তার উত্তর তাঁর রচনার মধ্যেই রয়েছে। তাঁর কাব্য সাধারণ মানুষের আবেগকে প্রতিফলিত করে এমন এক ভাষায় যাতে তিনি কথ্য ভাষার আস্বাদ সঞ্চার করতে পারেন। লোকে যেভাবে কথা বলে আভিধানিক না হয়ে, সতর্ক না হয়ে, ছক কেটে না রেখে, তেমনি ভাবে প্রেভের কবিতা লেখেন, আর তাঁর কাব্যে গল্প বলার স্বাদ নিয়ে আসেন। তাঁর সেই ভঙ্গিতে তিনি প্রকাশ করেন মনুষ্য-অনুভবকে, যে-ভালোবাসা ও তিক্ততা, যে করুণা ও মাধুর্য তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রয়, সেই আবেগকে। সাধারণ ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে তিনি যেমন আঁকেন সহজ এক বাঁচার আনন্দ, তেমন জীবনের ক্রূরতা ও প্রবঞ্চনা। কখনো লেখেন,

হাজার হাজার বছরেও কুলোবে না
যদি বর্ণনা করতে যাই
চিরন্তনকালের সেই ছোট্ট মুহূর্তটা
যখন তুমি আমাকে চুমু খেলে
যখন আমি তোমাকে চুমু খেলাম

শীতের এক সকালের আলোয়
ম'স্যুরি পার্কের ভিতরে প্যারিসে
প্যারিসে
পৃথিবীর উপর
পৃথিবী সে এক নক্ষত্র।

আবার কখনো বলেন :

উপোসী দিশেহারা ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট
সম্পূর্ণ একা কানাকড়িশূন্য
একটা ষোল বছরের মেয়ে
নিশ্চল দাঁড়িয়ে
প্লাস দ্য লা কঁকর্দে
পনেরই অগস্ট দুপুরে।

কিংবা :

কী সাংঘাতিক
শক্ত ডিমের ছোট্ট আওয়াজটা
রেস্তোরাঁর বারকোসের উপর ভাঙার সময়
সাংঘাতিক এই আওয়াজটা
যখন তা ক্ষুধার্ত মানুষটার
স্মৃতির মধ্যে নড়তে থাকে।

প্রেভের-এর কবিতা লোকের কাছে বন্ধুর মতো, ফাঁদে পড়তে সে তাদের বারণ করে :

ওখানে যেও না
সব আগে থেকে যোগসাজসে ঠিক হয়ে আছে প্রতিযোগিতাটা
একেবারে সাজানো।

মারাত্মক শ্লেষের মধ্যে দিয়ে প্রেভের নাটের গুরুদের দেখিয়ে দেন; যারা তাদের ক্ষমতা উন্নাসিকতা আর অমানুষিকতা দিয়ে জীবনকে দুঃসহ ক'রে তুলেছে, তাদের টেনে আনেন সামনে। তাঁর বিখ্যাত সুদীর্ঘ কবিতা **Diner de Tetes a Paris-France** তাঁর এই শ্লেষ-ক্ষমতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন; দীর্ঘতর কবিতা **La Crosse en Air**-এও সে-পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও

রাতের পাহারাদার ও ডানা-ভাঙা পাখির কথায় সে-কবিতা এক নিবিড় করুণ অথচ আশাময় সুরে শেষ হয়েছে।

প্রকাশ-পদ্ধতিতে প্রেভের-এর মুন্সিয়ানা যথেষ্ট। তিনি আশ্চর্য সাবলীলতার সঙ্গে এক শব্দ থেকে আর এক শব্দে, এক চিত্রকল্প থেকে আর এক চিত্রকল্পে চ'লে যান; কখনো তাদের তরতর ক'রে ব'য়ে যেতে দেন, কখনো ভেঙে ফেলেন, উল্টেপাল্টে দেন, এক অনুষঙ্গকে আর এক অনুষঙ্গে মিশিয়ে দেন। সুররিয়ালিস্ট 'স্বয়ংচল রচনা'র শিক্ষা তাঁর ভাষায় পরিস্ফুট।

আঁরি মিশো ফ্রান্সের অন্য সব কবি থেকে একেবারে পৃথক। তাঁর অ্যাডভেনচারে তিনি একক। মিশো এক নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি ক'রে তাকে তাঁর কল্পনার প্রাণী ও বস্তু দিয়ে ভরেছেন; তাঁর নিজের সত্তাও তার অন্তর্ভুক্ত। অবিচল অধ্যবসায়ে সেই জগৎকে তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরেন। অদ্ভুত ভ্রমণ বা অদ্ভুত দেশের বর্ণনাই হোক বা কল্পিত কোনো ব্যক্তির জীবনকাহিনী হোক অথবা নিজের মানস জীবনের চিত্রই হোক, সবই তাঁর সেই জগতের বৃত্তান্ত। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, মিশো যে-জগৎ সৃষ্টি করেছেন তা ইচ্ছাপূরণের জগৎ নয়, তা হল অনিশ্চিততার জগৎ, অদ্ভুত ও হৃদয়হীন ঘটনার জগৎ, যা কাউকে আশ্বস্ত করে না। সুতরাং তথাকথিত পলায়নী বৃত্তির অপবাদ তাঁকে দেওয়া যাবে না। যে-রাজার মূর্তি তাঁর ঘরে রাজত্ব করে তাকে তিনি অপমানিত করেন, ভেঙেচুরে ফেলতে চান, কিন্তু সে যেখানে ছিল সেখানেই থাকে, আবার রাজত্ব করে। যে-নারীকে তিনি সম্ভোগ করতে চান সে তাঁর কাছে এসে পাখির মতো ছোট হয়ে যায়। এমন কি রুটিটা পর্যন্ত জন্তু হয়ে খেতে চায়। তাঁর জগতে কাউকে বা কিছুকে আপন ক'রে পাওয়া যায় না। তাঁর স্বপ্নের জগতে স্বপ্ন নেই, তা যেন আমাদের বাস্তব অবস্থারই তীব্রতম প্রতিরূপ। কাল্পনিক রূপান্তরে তিনি বাস্তব জগতের বৈর পরিপার্শ্বকেই যেন প্রকাশ করতে চান। এ এক নিরাশাবাদ, কিন্তু মিশোর নিরাশাবাদে একমাত্র স্বস্তিকর বিষয় হল শিল্পকর্মে তাঁর আস্থা। তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি লেখেন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেই, "শত্রু জগতের চেপে ধরার শক্তিগুলোকে" ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে। বোধ হয় শিল্প সৃষ্টির উদ্যমেই তিনি খুঁজে পান একমাত্র এলাকা যেখানে মানুষ নিজের প্রভু, যেখানে সে ভগবানের ভূমিকায়। মিশো প্রধানত লেখেন গদ্যে, যাতে কোনো 'কাব্যিকতা' নেই।

র‍্যনে শার তাঁর কাব্যের সুরে মিশোর সম্পূর্ণ বশীভূত। জীবনের প্রতি ভালোবাসায় তা ধ্বনিত। কিন্তু সে-ভালোবাসার মূলে আছে জীবনের যন্ত্রণা সম্বন্ধে তাঁর চেতনা। তাঁর অনুভূতি সরলরেখায় অঙ্কিত নয়, ছায়া আলো শূন্যতা উচ্ছলতার জটিল রেখায় মূর্ত। তারই মধ্যে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো প্রকাশ পায় মানুষের মুখ, ভবিষ্যতের দিকে বাড়ানো: 'এই তো মৃত বালি, এই তো শরীর পরিত্রাণ পেল, নারী নিশ্বাস নেয়, পুরুষ সোজা দাঁড়িয়ে।'

তাঁর কাব্যে যে-আশা মাঝেমাঝে দীপ্ত হয়ে ওঠে তার কেন্দ্রে কবি। কবির আশার মধ্যেই সমস্ত জগৎ বেঁচে: 'অদৃশ্য হয়ে যাবার আকুলতা সত্ত্বেও আমার ছিল অপর্যাপ্ত প্রতীক্ষা, দুর্দম বিশ্বাস। হাল ছাড়া নয় কোনো মতে।' দৃপ্ত কণ্ঠে শার ঘোষণা করেন: 'প্রত্যেকবার সব প্রমাণ যখন ভেঙে পড়ে, তখন কবি জবাব দেয় কামানের মতো ভবিষ্যৎ বেগে।'

মৃত্তিকে উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন: 'তার কথা অন্ধ মেঘ ছিল না, ছিল সেই চিত্রপট যাতে আমার নিঃশ্বাস অঙ্কিত হয়েছিল'।

শার তাঁর রচনায় শব্দবাহুল্যকে সর্বদা পরিহার করেন, তা অপরিহার্য শব্দের এক ঠাসবুনোনি। এর ফলে প্রথম পাঠে তাঁর কবিতা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য। কিন্তু দরদী ও অধ্যবসায়ী পাঠক ক্রমেই আবিষ্কার করেন তাঁর ব্যবহৃত শব্দের বিশেষ শক্তি, যাকে ফরাসী সমালোচকেরা আখ্যা দিয়েছেন **valeur explosive**। তাছাড়া এক-একটা উজ্জ্বল চিত্রকল্পে তাঁর বক্তব্য প্রায়ই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

১৯৫৫

জেনে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাওয়া গেল যে, ফরাসী দেশে কবিদের দুর্দশা বাংলা দেশের চেয়ে কম নয়। ইংরেজ দেশ হলে কী মনে হত জানি না; কিন্তু দেশটা ফ্রান্স হওয়ায় মনে হচ্ছে যেন হিসেব মিলে গেল। আড্ডা দেওয়া এবং কাব্য করার মেজাজটা যখন, শুনি, আমাদের একই রকম, তখন ফলটা দুরকম হ'লে মন খুঁতখুঁত করত। যাক. তাহলে ওখানকা'র বাজারেও কবিরা একেবারে কোণঠাসা।

যদি কেউ আপত্তি ক'রে ওখানকার লাখ দু-লাখী কবি-মনসবদারের নাম করেন, ফরাসীদের জবানিতেই বলব: **Un cheveu n'est pas la perruque**। তিনি দুজনকেই দেখছেন, আটানব্বুইজনকে দেখছেন না। জানি, পল ঝেরাল্‌দি-র **Toi et Moi** কেটেছে এক লাখ, আর শেষ খবর পেলাম ঝাক প্রেভের-এর **Paroles** দুলাখ চল্লিশ হাজার। কিন্তু এ থেকেই কি বোঝা যায় কাব্যের প্রতি প্রেমের জোয়ার এসেছে হঠাৎ? নেহাৎ বাজে কবি না হওয়া সত্ত্বেও প্রেভের-এর এই বিক্রি নিশ্চয়ই এক বিস্ময়। সেই জন্যেই তো এখন বলা হচ্ছে **le miracle Prevert**। আর কিছু না হোক, তাঁর এই বিক্রির জন্যেই দুনিয়ার সব কবির বুক দশ হাত হয়ে যাওয়া উচিত এবং তাঁর নামে সব জায়গায় কবিদের বাজি পোড়ানো উচিত কিন্তু এই বিক্রির কারণটা খুব কাব্যিক কিনা তাও ভাববার আছে। আরো তো সত্যিকার বড় কবি রয়েছেন সেখানে। তাঁদের বই তেমন চলে না কেন?

আমার ধারণা, প্রেভের-এর বাহাদুরি অন্যত্র। তিনি জানেন, কী ক'রে লোককে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ভালো কবিতা পড়িয়ে নেওয়া যায়। গল্পচ্ছলে কবিতা পড়িয়ে নিতে তিনি জানেন কিংবা গানের মতো ক'রে কবিতা গাইয়ে নিতে। সেই মার্বেল খেলা দিয়ে মাস্টারমশাইয়ের অঙ্ক শেখানো আর কি, অথচ ছাত্ররা ধরতে পারছে না। ঝেরাল্‌দির চাহিদার মধ্যে কিন্তু অত রহস্য নেই। সংসারধম্মো করতে করতে স্বামী-স্ত্রীরা যেমন প্রেম-ট্রেম ক'রে থাকেন,

খেয়াল্ দি বেশ মিঠে-কড়া ক'রে সেই সব কথা লেখেন। উপহার দেবার এবং ঘরে রাখবার মতো এমন বই কি আর হয়? আপিস থেকে খেটেখুটে এসে একটু জিরিয়ে নেওয়ার পর কর্তারা এ-বই খুলে গিন্নীদের বলতে পারেন: "এসো, একটু কবিতা পড়া যাক।" ড্রইংরুমী আলাপে এ-কবিতা উদ্ধৃত ক'রে হৃদয়জয়ও করা যেতে পারে। এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করলে আমাদের কবিরাও লাভবান হতে পারেন। তা কি আর একেবারেই করা হচ্ছে না? বিয়ে এবং জন্মদিনের প্রতি নজর তো আজকাল প্রায় সব বইয়ের মলাটেই জলজ্বল করে। মোট কথা, কোনো কবি বা কবিতার বইয়ের রেকর্ড-ভাঙা বিক্রি থেকে ধ'রে নেওয়া যায় না কবিতার প্রতি লোকের টান বেড়েছে। স্বদেশের দৃষ্টান্ত এনে আমিও তো বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের বই আজকাল প্রচুর বিক্রি হয়। তাতে কি প্রমাণ হয় বাঙালীরা হঠাৎ দারুণ কাব্যপ্রেমিক হয়ে উঠেছে, এমন কি রবীন্দ্র-কাব্যপ্রেমিক? বাস্তবিকপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর কাব্য নিয়ে মশগুল হবার ফুরসৎই বা কোথায় বাঙালীদের, তাঁর জয়ন্তী নিয়েই যে মেতে থাকতে হয়! কিন্তু তাতে বইয়ের বিক্রি বাড়ে। কেনাবেচার বাজারে পড়তা কী ক'রে তৈরি হয় তা ব্যবসায়ীরা ঠিক বোঝে। কবিরা তা কস্মিনকালেও বুঝবে না, যদি না তারা ব্যবসায়ী হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ কবি ছিলেন, সুতরাং জীবিতকালে এ ব্যাপার কল্পনাও করতে পারেননি।

সব ব্যবসার মতো বইয়ের ব্যবসারও আজকাল এক চমৎকার অস্ত্র তৈরি হয়েছে: বিজ্ঞাপন। মূলত বিক্রি বেড়েছে সংবাদপত্রের। তাকে অবলম্বন ক'রে অন্যের। বইয়ের বিক্রি বাই-প্রডাক্ট। সংবাদপত্রের মারফত লেখকের কাট্তি বাড়ানো যায়। লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে রাতারাতি প্রচার ক'রে দেওয়া যায় অমুক লেখক মহালেখক। বিজ্ঞাপন কেন, যে-কোনো ভাবে যে-কোনো লেখকের নাম বড় বড় কাগজে বার কয়েক ছাপাতে পারলেই হয়, তিনি ভারত-বিখ্যাত হলেন। কবিদেরও যে এ রকম প্রচার হয় না তা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুব বেশি কাজ দেয় না, কারণ কবিতা কিছুতেই আর গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। ব্যবসায়ীরা সেটা খুবই জানে। সেই জন্যেই সাধারণভাবে কবিদের প্রতি তাদের বিরাগ এবং কবিদের দুর্দশা।

বিজ্ঞাপন প্রচারের ফলে কবিতার কাটতি নিশ্চয়ই একটু বাড়ে। কিন্তু সেটা তেমন কিছু লাভের নয়। অথচ সেই সঙ্গে ক্ষতি একটা হয়। সেটা পোষাবে কী ক'রে? যখন প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দাপট ছিল না, তখন যে

ক'-জন কবিতা পড়ত, তারা ধ'রে নেওয়া যায়, ভালোবেসেই পড়ত এবং নিজেদের মতো ক'রেই বুঝত বা অনুভব করত। প্রচারের জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে যেত না তখন। সুতরাং মনে করা যায়, বিভিন্ন কবির রচনার একটা আন্তরিক মূল্য-নিরূপণ হত। কিন্তু এখন কবিতা-পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রচারের ধমক অহরহ উদ্যত। তাদের উপর ধারণা আগে থেকেই চাপিয়ে দেওয়া হয়। সে-বোঝা ঠেলে মাথা সোজা করা শক্ত। এই সঙ্গে মলাটের কথাটাও কিঞ্চিৎ বিবেচ্য। কবিতা যাই হোক মলাটের বাহার চাঞ্চল্যকর। যেন ঐটাই প্রধান পরিচয়। বইটা দেখতে বিশ্রী হবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু তাই ব'লে মলাটটা অত হৈ-চৈ করবে কেন? অথচ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে এখন যে, তাক লাগাবার মতো মলাট না হলে বই তেমন বিক্রিই হবে না। এই মলাটের অত্যাচার থেকে কারো পরিত্রাণ নেই। এ-বিষয়ে কিন্তু ফরাসী দেশ থেকে আমাদের অনেক তফাৎ। ফরাসী কবিতার বইয়ের সাধারণ সংস্করণ সবই এক রকম; কোনো প্রচ্ছদ ছবির বালাই নেই, থাকলেও একই ধরনের সাদাসিধে। যেন সব বই বলছে, প'ড়ে দেখ আমরা কে কী রকম। ইচ্ছে করলে লেখক বা প্রকাশক রাজ সংস্করণ বা শোভন সংস্করণ প্রকাশ করুন না। সে-স্বাধীনতা তাঁদের কে হরণ করছে?

তবু দুর্দশা ঘোচে না। মুদ্রণের মাত্রাবোধ আর রসবোধ দিয়ে কবিদের রক্ষা করা যাচ্ছে কই? সেই দুর্দশার কাহিনীতেই ফিরে আসি। ফ্রান্সে কবিতার কাগজ টেঁকে না এবং কবিরা বই ছাপানোর জন্যে প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘোরে। অন্য পরে কা কথা, এল্যুয়ারের মতো কবি যুদ্ধের পর বের করেছিলেন কবিতা-পত্রিকা, **L'Eternelle Revue,** চালাতে পারলেন না। কয়েক সংখ্যা বেরিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। কবি-প্রকাশক পিয়ের সেগের্স্ পর্যন্ত নাজেহাল হয়ে গেলেন; তাঁর **Poésie** পত্রিকা কয়েক বছর চলার পর উঠে গেল। কবি মাক্স পল-ফুশে পরিচালনা করছিলেন **Fontaine,** ভালো ভালো কবিকে জুটিয়েছিলেন এই পত্রিকায়, তাও চলল না শেষ পর্যন্ত। এই অকাল মৃত্যুর তালিকায় আরো নাম আছে, যেমন **Meridien, Confluences**। কোনো কোনো পত্রিকা নিয়মিত বেরুতে পারে না, সাময়িক ভাবে বা বাৎসরিক ভাবে এক-একটা বিশেষ সংখ্যার আকারে আত্মপ্রকাশ করে। যথা: **Tour de Feu, Les Lettres**। তবু বলতে হবে কয়েকটি পত্রিকা আশ্চর্যভাবে টিঁকে আছে, যেমন বাংলা দেশে আছে। অবশ্য সংখ্যায় ফ্রান্সে বেশি, বোধহয়

কবির সংখ্যাই বেশি ব'লে। (একদা ভারতে নবাগত এক ফরাসী ভদ্রলোক মন্তব্য করেছিলেন, বাংলাদেশে কবির খুব প্রাদুর্ভাব; উত্তরে আমাকে বলতে হয়েছিল, ফ্রান্সের চেয়ে কম উক্তিটা ভিত্তিহীন নয়। তুলনায় কম তো হবেই বাংলাদেশে, কারণ আক্ষরিক অর্থে লিখতে জানে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম). যে সব পত্রিকা এমন কঠিন প্রাণ নিয়ে জন্মায়, তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম করা যেতে পারে: **Cahiers du Sud, Bouteille a la Mer, Escales, France-Poe'sie, Caracteres, Paragraphes, Message amical de Poe'sie, Points et Contre-Points** এমনও হতে পারে, এদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে চোখ বুজেছে।

বই ছাপানোই কি কম মুশকিল। যাঁদের খ্যাতি বা ঝুটা বেশ একটা নাম-ডাক হয়েছে তাঁরা অবশ্যই প্রকাশক পান। যাঁদের হয়নি তাঁরাও পান, কিন্তু তাঁদের বই ছাপা হয় লেখকের খরচায়। অনেক সময় লেখককে বন্ধু বান্ধবের কাছে অগ্রিম বিক্রি ক'রে ছাপা-খরচ তুলতে হয়। **Bulletins de souscription** নিয়ে ঘুরতে হয়। মানে বই ছাপবার আগে ছাপাতে হয় চাঁদা খাতা। অথচ গল্প-উপন্যাস লিখতে পারলে ও সমস্যাই উঠত না সম্রাট থেকে আরম্ভ ক'রে জোতদার পর্যন্ত সকলকেই প্রকাশকেরা ভক্তিভরে সেবা করতেন, কারণ তাঁরা জানেন ওতে পয়সা আসে। তবু নাকি কবিতা একটা জাতের শিল্প-চেতনায় শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, তার হৃদয়ের তুঙ্গ বিন্দু!

অনেক ক্ষেত্রেই ছাপার অক্ষরে নাম দেখার জন্যে কবিদের বেশ কিছুকাল পত্রিকানির্ভর হয়ে থাকতে হয়। "প্রকাশের ব্যাকুলতা" প্রশমনের অন্য পন্থা; ফ্রান্সের বড় বড় পত্রিকায় (**Revues de grand public**) আবার কবিতা সাধারণত ছাপা হয় না, এক **Mercure de France** ছাড়া। সুতরাং ছোট-খাট পত্রিকা, প্রধানত কবিতা-পত্রিকাকেই, অবলম্বন করতে হয়। অথচ তাদের অবস্থা তো বললাম। এদেরই কোনো রকমে টিকিয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই। এই টিকিয়ে রাখার জন্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফরাসী কবিরা যা করে, সে-এক আশ্চর্য কাণ্ড। তারা হাত-প্রেস বসিয়ে নিজের হাতেই কাগজ ছাপায়। যে-জীবিত কাগজগুলোর নাম করেছি তাদের কয়েকটি এই ভাবেই বেরোয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ফরাসী কবিদের মধ্যে কিছু মুদ্রাকর আছেন। তাঁরাই এই উদ্যমের কাণ্ডারী। বাঙালী কবিরা এ

এ বিষয়ে এখনো অনেক পিছিয়ে। তাঁদের তরফ থেকে বাংলার মুদ্রাকরদের ভাঙানি দেবার সময় এসেছে।

অবশ্যই ফ্রান্সে কবিতার বই বাংলার তুলনায় বেশি ছাপানো হয় এবং বিক্রিও বেশি হয়। কিন্তু সে-পার্থক্যের কারণ অনুমান করা দুরূহ নয়। আপেক্ষিকভাবে সেখানকার লোকদের তথা কবিদেরও পয়সা বেশি এবং লিখতে পড়তে পারে এমন মানুষেরও সংখ্যা বেশি। কিন্তু গড়পড়তা কবিতার বই যতই বিক্রি হোক বাড়ি গাড়ি হবার মতো বিক্রি হয় না, খাওয়া-পরা চলার মতোও নয়। যদি হত, তাহলে প্রকাশকেরা দূরে স'রে থাকতেন না। এ অবস্থায় নিজের পয়সায় বা বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে চাঁদা তুলে গ্রন্থ প্রকাশ ছাড়া আর করণীয় কী আছে?

কবিদের কিছু পয়সা পাবার আর একটা পথ আছে ফ্রান্সে। কবিতার জন্যে সরকারী-বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠানের নানা পুরস্কার আছে। তার কোনোটা যদি পাওয়া যায়। কিন্তু তা পাওয়ার ঝঞ্ঝাট আছে। তদ্‌বির তদারক করা, খাতির রাখা, কলকাঠি টেপা, সে অনেক ঝঞ্ঝাট। সকলের ধাতে তা সইবে কেন? এ খবরটা জেনেও বেশ সান্ত্বনা পাওয়া গেল, বেশ আত্মীয়তা অনুভব করা গেল ফরাসীদের সঙ্গে। আহা, তাহলে ওখানেও এমন হয়।

এই হল ফরাসী কবিদের অবস্থা। মোটেই সুবিধের নয় আমাদের চেয়ে। অথচ লেখার দেখি কারোও কামাই নেই। সুতরাং গাদাগাদা তর্ক-বিতর্কের পরেও প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে: কবিরা লেখেন কার জন্যে? তাই তো, কার জন্যে? বড়ই গোলমেলে প্রশ্ন। ও নিয়ে কিছু বলতে যাওয়ার মানে গোলমেলে এক প্রবন্ধ লিখতে বসা: অতএব সম্পাদক মশাইয়ের অনুমতি-ক্রমে প্রসঙ্গটা আপাতত চাপা দেওয়া যাক।

১৯৫৩

পল এলুয়্যার

(১৯৫২ সালের নভেম্বরে এলুয়্যার-এর মৃত্যু উপলক্ষ্যে লেখা)

ফরাসী কবি পল এলুয়্যার আমাদের দেশে পরিচিত হলেন গত মহাযুদ্ধের সময়। নাৎসী দখলের বিরুদ্ধে ফরাসী প্রতিরোধ-সংগ্রামে তাঁর উদ্যম এই পরিচয়ের সূত্র। আমরা শুনলাম তাঁর বিখ্যাত 'লিবের্তে' (স্বাধীনতা) কবিতার কথা। আরও শুনলাম তাঁর কমিউনিস্ট তৎপরতায় অংশগ্রহণের কথা। কিন্তু ভাষার দুস্তর ব্যবধানের জন্যে তাঁর কবি-কর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হতে পারেনি। আমরা কেউ কেউ হয়তো কল্পনায় তাঁর এক নকল মূর্তি তৈরি করেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো রাজনীতির সংজ্ঞায় তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল অথবা প্রতিকূল সহজীকরণ হয়ে গিয়েছে।

আধুনিক ফ্রান্সের কাব্যনায়কদের মধ্যে দুটি নাম একত্রে স্মরণীয়: এলুয়্যার ও আরাগঁ। দুজনে প্রায় সমবয়সী, এলুয়্যার-এর জন্ম ১৮৯৫ সালে, আরাগঁর ১৮৯৭-তে। দুজনেই প্যারিসের সন্তান। দুজনের সাহিত্য-জীবন শুরু একই পরিমণ্ডলে: স্যুররেয়ালিস্ট আন্দোলনে। দুজনের পরিণতি একই পরিমণ্ডলে: কমিউনিস্ট আন্দোলনে। অথচ দুজনকে যদি পাশাপাশি দেখা যেত, তবে দুজনের সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্যই নজরে আসত বেশি। আরাগঁর ভঙ্গি তীব্র, তীক্ষ্ণ, তাঁর বাচন ক্ষিপ্রগতি, উচ্ছল। আর এলুয়্যার মাধুর্য ও প্রশান্তির প্রতিমূর্তি। তাঁর অঙ্গসঞ্চালনে দেখা যেত এক সহজ গাম্ভীর্য, কথায় ছোঁয়া যেত এক গভীর নিশ্চিন্ততা। দুজনের এই ভিন্ন চারিত্র্য তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টিতে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত, এমনকি সৃষ্টির প্রকৃতিতেও। আরাগঁর উদ্বেল শক্তি সাহিত্যের নানা বিভাগে আত্মপ্রকাশ করেছে: কাব্যে, উপন্যাসে, ছোট গল্পে, শিল্পসাহিত্য-সমালোচনায়, সাংবাদিকতায়। কোন্ শ্রেণীর রচনায় যে তিনি বড় তা এখনো তর্কের বিষয়। ভবিষ্যৎ হয়তো রায় দেবে গদ্যলেখক ঔপন্যাসিক আরাগঁ কবি আরাগঁর চেয়ে বড়। কিন্তু

এলুয়ার-এর সঙ্গে যেখানেই সাক্ষাৎ হোক, তিনি কবি। তাঁর উপলব্ধি কবিতা ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম গ্রহণ করেনি। প্রবন্ধ অবশ্য সময়ে সময়ে তিনি লিখেছেন, তা তাঁর কবিতারই জাতের, স্বচ্ছতায়, নিবিষ্টতায়। আর প্রবন্ধ তো সৃষ্টি নয়, সৃষ্টির নিশানা। যে-প্রতিভা একই সঙ্গে কাব্য ও উপন্যাসের মধ্যে নিজের ঘর খুঁজে পায়, তার জাতবিচারের তর্ক এখানে তোলার প্রয়োজন নেই। শুধু এই মনে হয় যে, এলুয়ার-এর পক্ষে কাব্যের বাইরে আত্মপ্রকাশ করা যেন সম্ভব ছিল না।

এলুয়ার-এর কবিতা পড়লে যে-বিশেষণটা আমার প্রথমেই মনে আসে তা হল 'ধ্যানমগ্ন'। নিজের মধ্যে নিজে ডুবে আছেন। সমস্ত পৃথিবী, বস্তুপুঞ্জ হৃদয়ের গভীরে জারিত হয়ে এক বিশুদ্ধ রূপান্তরে জন্ম নিচ্ছে। সেইজন্যে স্যুররেয়ালিস্ট মগ্নচৈতন্যের স্রোতে তিনি যত স্বাভাবিকভাবে গা ভাসাতে পেরেছিলেন অন্য অনেকে তা পারেননি। আরাগঁ নিশ্চয় নয়।

গোড়া থেকেই এলুয়ার-এর জগৎ ছিল ধ্যানের জগৎ এবং সে-ধ্যান প্রেমকে ঘিরে। প্রায় চল্লিশ বছরের একটানা কাব্যসাধনায় এই বিষয় থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হননি। তাঁর ঘৃণা ও ক্রোধের প্রকাশও এরই অঙ্কুশে। প্রথম দিকে এ-সাধনা ছিল একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক। তিনি চেষ্টা করেছেন প্রেম ও নিঃসঙ্গতাকে একটা অন্যনিরপেক্ষ শুদ্ধ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে। ভাষা সেখানে কূল পায় না। তাই মিস্টিক কাব্যের সঙ্গে তাঁর এ-কাব্যের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। "গূঢ় উল্লেখ, যুক্তিগ্রাহ্য সংযোগ বিলোপ, এক শব্দ দিয়ে আর এক শব্দের বিনাশ" এই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। পরে অবশ্য বিবর্তন হয়েছে (পরিবর্তন নয়, বিবর্তন), কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পদ্ধতি এই রকমই থেকে গিয়েছে।

সত্তার এক বিশুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছবার জন্যে তাঁর প্রয়াস ছিল যেন প্রাণপণ, যেমন র‍্যাঁবোর ছিল পরমজ্ঞানে পৌঁছবার জন্যে। এলুয়ার-কাব্যের বিহার তাই বিশুদ্ধতার আকাশে। তিনি নিজেই বলছেন এক কবিতায়:

অল্প বয়সেই আমি বিশুদ্ধতার দিকে বাহু প্রসারিত করেছি।···
আমার পতন আর সম্ভব ছিল না।

—La Dame de Carreau (১৯২৬)

তেরো বছর পরে আবার সেই কথাই কি বললেন না অন্যভাবে, নিজেকে আরো মেলে দিয়ে?—

আমার নিসর্গপট হল এক বিরাট মুখ
আর আমার মুখ এক স্বচ্ছ জগৎ
অন্য জায়গায় ওরা কালো কান্না কাঁদে
ওরা গুহা থেকে গুহায় যায়
এখানে কেউ নিজেকে হারাতে পারে না
এবং আমার মুখ বিশুদ্ধ জলে আমি তাকে দেখি
একটা গাছের মহিমা গাইতে
নুড়িগুলোকে নরম করতে
দিগন্তকে প্রতিফলিত করতে
গাছের উপর আমি ভর দিই
নুড়িগুলোর উপর শুই
জলের উপর সূর্যকে বৃষ্টিকে অভিনন্দিত করি
আর গম্ভীর হাওয়াকে

—Me´dieuses (১৯৩৯)

এল্যুয়ার সব সময়ে একটা স্থির কেন্দ্রে যেতে চেয়েছেন যেখানে সবই তুল্যমূল্য, আলো যেখানে ছায়া, ছায়া আলো, যেখানে তুষারে আগুনে তফাৎ নেই, যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা অতীন্দ্রিয়তার নামান্তর। তাঁর কবিতায় তাই বস্তুর নামে জড়িয়ে জড়িয়ে, বিশেষণে জড়িয়ে জড়িয়ে এত প্রতিতুলনার খেলা। আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন এই পরস্পরবিরোধী শব্দযোজনার আর কোনো অর্থ নেই। তিনি যেখানে ভারসাম্য খুঁজছেন তার আবহাওয়া এই রকম একাকার হওয়ারই কথা, কারণ তিনি ধরতে চাইছেন সেই কেন্দ্র বিন্দু যেখানে রক্তমাংস আর হৃদয়মনের, বাস্তব আর আদর্শের পরস্পরবিরোধী অর্থ নেই। কিন্তু এই অসম্ভব প্রয়াসে হতাশা আসে এক-এক সময়। সাময়িক যন্ত্রণায় মুক্তির মানসীকে উদ্দেশ ক'রে বলতে হয়:

আমার যৌবনকালের মতো এখনো কেন আমাকে
তোমার শিষ্য ব'লে ঘোষণা করতে পারি না, এখানো কেন
তোমার সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি না ছুরি আর ছুরি
যা কাটে তার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ মিল। পিয়ানো আর
নিস্তব্ধতা, দিগন্ত আর দূরবিসার।

—Nuits partage´es (১৯৩২)

তবু তাঁর কবি চেতনার অবস্থানই এই কেন্দ্রে। মুহূর্তে তিনি এই জগতের সমস্ত খণ্ড চেতনাকে খণ্ডখণ্ড ক'রে, বস্তুর রূপবৈচিত্র্য ও বিরোধিতাকে কাটাকুটি ক'রে এই অবর্ণনীয় লোকে যাত্রা করতে পারেন। পৃথিবীর মাটি দিয়ে তিনি ঘর গড়তে পারেন পৃথিবীর বাইরে। নিজে তিনি এবিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন :

আমার ক্ষমতা আছে বিনা অদৃষ্টে বেঁচে থাকার
হিম আর শিশিরের মাঝখানে বিস্মৃতি আর উপস্থিতির মাঝখানে
—Me'dieuses

অথবা

পৃথিবীর গূঢ় সৌরভ আর শিশিরের গূঢ়
বয়সহীন যুক্তিবুদ্ধিহীন বন্ধনহীন
ছায়াহীন নিশ্বাস
—Au premier mot limpide (১৯৩৯)

এ তো তাঁর মুক্তিই। কোনো পার্থক্য নেই, এমনকি বস্তুর সঙ্গে তাঁর নিজেরও কোনো পার্থক্য নেই, তাঁর সত্তায় তা সঞ্চারিত, একীভূত :

আমি ছিলাম মানুষ আমি ছিলাম পাথর
আমি ছিলাম মানুষের ভিতরের পাথর পাথরের ভিতরের মানুষ
আমি ছিলাম আকাশে পাখি পাখিতে শূন্য
আমি ছিলাম শীতে ফুল সূর্যে নদী
শিশিরের ভিতরে চুনি

ভ্রাতৃত্বে একক ভ্রাতৃত্বে মুক্ত
—Mes heures (১৯৪১)

কিন্তু এর আগেই স্পেন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। সে-যুদ্ধের আঁচ লেগেছে তাঁর কবিতায়। তাঁর মনে পড়ছে "দ্বিপ্রহরের ভয়ঙ্কর মহাসাগর, টুঁটিচাপা মৃতদেহ" অদৃষ্টহীন আস্তিত্বের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের অদৃষ্ট মিলিয়েছেন সব মানুষের সঙ্গে। ভ্রাতৃত্বের চেতনা বিস্তৃত হ'য়ে নতুন প্রত্যাশায় উৎসারিত হয়েছে, তাই উপরের ঐ ভূমিকার পরেই বলছেন :

সমস্ত শাখাপ্রশাখা জুড়ে
আমার পাতারা আবার জন্মায়

আমার পথ শোভিত হল
সূর্যস্নাত মঙ্গলে

সব কিছুকে অঙ্গীকার ক'রে সব কিছুকে ছাড়িয়ে যাবার যে-প্রবণতা তাঁর প্রথম থেকেই, তা কিন্তু প্রসারিত সমাজ-চেতনার বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং বলতে হবে সহায়ক হয়েছে। কারণ মানুষের জীবনে তীব্র জৈব আবেগের অস্তিত্বের সঙ্গে বিপ্লবী পটভূমিতে তাকে অতিক্রম করার অনাসক্তির তিনি সমন্বয় করেছেন সহজে। "গের্নিকার জয়" কবিতায় যেন এই কথাই দুটি সরল সুন্দর ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে :

বাঁচবার আর মরবার ভয় এবং সাহস
এত কঠিন এবং এত সহজ মৃত্যু
—La Victoire de Guernica (১৯৩৮)

এল্যুয়ার-কাব্যের মূল সুর যে-প্রেম তা বর্ণনার অতীত এই ভারসাম্যেরই সন্ধানে নিরন্তর ব্যাপৃত। যে-নারীকে তিনি ভালোবাসেন সে ছায়াসঙ্গিনী, তার স্পর্শ রাত্রে অন্ধকারে স্বপ্নে। কিন্তু সেখানে তিনি দিনের আলো মেলাতে চান, ছায়ায় থেকে ছায়াহীন হতে চান, নিদ্রা-জাগরণকে একাকার ক'রে অনন্ত হতে চান দুজনে। শেষ পর্যন্ত দুজনও নয়, একজন। কেননা সমস্ত ভেদ বিলুপ্ত করাই তাঁর অবিচল আকাঙ্ক্ষা। এল্যুয়ার-এর কবিতায় প্রেমের যে আত্মবিলুপ্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায়, তা বোধহয় ইয়োরোপীয় অন্য কোনো কবির রচনায় দেখতে পাওয়া যাবে না।

তাঁর প্রেমের জগৎ ও তাঁর প্রয়াসের একটা বিবরণ তাঁরই কবিতার ভাষাতে এই :

আমার সমস্ত কামনা স্বপ্ন-সঞ্জাত। আমি বাক্য দিয়ে আমার প্রেম প্রমাণ করেছি। কোন্ অপার্থিব প্রাণীর কাছে আমি নিজেকে সমর্পণ করেছি, কোন্ যন্ত্রণা ও আনন্দের জগতে আমার কল্পনা আমাকে আটক করেছে। এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, আমি ভালোবাসা পেয়েছি সবচেয়ে রহস্যময় রাজ্যে, আমার রাজ্যে। আমার প্রেমের ভাষা মানুষের ভাষা নয়, আমার মনুষ্য-শরীর আমার প্রেমের রক্তমাংসকে স্পর্শ করে না। আমার

প্রেমের কল্পনা বরাবরই এমন একাগ্র ও সমুচ্চ যে, কেউ আমাকে
তা ভ্রান্ত ব'লে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে না।

—A la fenetre (১৯২৬)

বস্তুকে ভের ক'রে যেমন বস্তুনিরপেক্ষতায় পৌঁছতে চেয়েছেন তিনি, তেমনি একজনকে উদ্দেশ ক'রে বিভেদহীন রূপহীন সত্তায়: "সমস্ত নারী কোনো নারী নয়।" উপস্থিতি অনুপস্থিতির সমার্থক, দৃশ্য দৃশ্যহীনতার*—

আমরা দর্শকদের প্রবেশ নিষেধ করেছি, কারণ কোনো অভিনয়-দৃশ্য নেই। নির্জন ক্ষণের জন্যে স্মরণ করো শূন্য মঞ্চ, পটহীন অভিনেতাহীন বাদকহীন। লোকে বলে: পৃথিবীর নাট্যশালা, বিশ্বরঙ্গমঞ্চ। আমরা দুজনে আর জানি না তা কী—প্রত্যেকে একটি ছায়া, কিন্তু ছায়ার ভিতরে আমরা তা ভুলছি।

—Nuits partage'es

প্রেম ও নির্জনতার এই সুর বারে বারে এসেছে তাঁর কবিতায়। ১৯৩২-এর ঐ কবিতার পর ১৯৩৬-এ Les Yeux fertiles গ্রন্থে আবার বলছেন:

আমি তোমাকে আমার নির্জনতার পরিমাপে গড়েছি
সমস্ত পৃথিবীর লুকিয়ে থাকার জন্যে
দিন রাতের পরস্পরকে বোঝার জন্যে···

দিন ও রাত তোমার চোখের পাতায় নিয়ন্ত্রিত।

—Intimes

সামান্যতম বিভেদেরও অবলেশ যেখানে নেই, সাধারণগ্রাহ্য সমস্ত বিভিন্নতা ও বিরোধিতা বিলোপের পটভূমিতে যেখানে শুধু একাত্মতার এক অদ্বিতীয় স্বচ্ছ অস্তিত্ব, সেখানে কবির সহযাত্রী হওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু তাঁর বিচরণ অক্লান্ত। এবং এরই গুণে এল্যুয়ার-এর প্রেমের কাব্যে এক এক সময় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এমন-এক আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা যার তুলনা বিরল। কখনো বিনা বক্তব্যে কথা ফোটে, কখনো শুধু প্রেমের নামই মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়,

* মালার্মের কথা মনে পড়ে, Je dis : une fleur et...musicalement se le`ve...l'absente de tous bouquets.—আমি বলি: একটা ফুল আর সঙ্গীতের মতো উঠে আসে সমস্ত তোড়ায় যে অনুপস্থিত।

কখনো দুজনের দুটি চোখই থাকে কেবল, কখনো দুজনের কথা একই মুখে প'লে যায়। অবিচ্ছিন্ন ধারায় এই স্রোত ব'য়ে গেছে তাঁর কাব্যে। পর পর তাই পড়ি :

ওর চোখ সব সময় খোলা
ও আমাকে ঘুমোতে দেয় না
পূর্ণ আলোর ওর স্বপ্ন
সব সূর্যকে উবিয়ে দেয়
আমাকে হাসায়, হাসায় আর কাঁদায়
কথা বলায় কিছু বলার না রেখে

—L'Amoureuse (১৯২৪)

সারা পৃথিবী তোমার নির্মল চোখদুটির উপর নির্ভর ক'রে আছে
আর আমার সমস্ত রক্ত তাদের দৃষ্টিতে বহমান।

—Au Hasard (১৯২৬)

বাতাসের এক মুখ আছে যে-মুখকে ভালোবাসতে হয়
যে-মুখ ভালোবাসে, তোমার মুখ…
আমি গান গাই আমি তোমাকে ভালোবাসি
সেই রহস্যের গান গাইবার জন্যে যেখানে প্রেম আমাকে সৃষ্টি
ক'রে মুক্তি পায়।

—Celle de toujours, toute (১৯২৬)

আমি শুধু তোমারই মুখ দেখাই
তোমার কণ্ঠের বিশাল ঝড়
যা কিছু আমার জানা যা কিছু আমার অজানা
আমার প্রেম তোমার প্রেম তোমার প্রেম তোমার প্রেম

—Amoureuses (১৯৩২)

তোমাতে আমার বিশ্বাস এমন পরিবৃত
মাটি আর জলের দ্বারা, এমন আবৃত
স্নিগ্ধ সূর্য আর নির্মেঘ রাত্রির দ্বারা যে,

আমি তোমাকে দেখি স্বপ্ন দেখতে বাঁচতে আর ঘুমোতে
তোমারই চোখ দিয়ে।

—Règnes (১৯৪০)

শোনো আমি উত্তর দিই
তোমার সমস্ত কথার প্রথমের শেষের
গুঞ্জনের চিৎকারের উৎসের শিখরের
আমি তোমাকে উত্তর দিই আমার সীমাহীন প্রেম…
আমার বাহুবন্ধনে যে-সূর্য জলে তাকে ছাড়া
অন্য কোনো সূর্যের কথা না ভেবে
আমাদের প্রেম ছাড়া
অন্য কোনো নামে তোমাকে না ডেকে
আমি দেয়ালের মধ্যে বাঁচি রাজত্ব করি
আমি দেয়ালের বাইরে বাঁচি রাজত্ব করি

—"Je veux qu'elle soit reine" (১৯৪০)

তোমার মুখের মধ্যে আমাদের সব কথা
তোমার বুকের মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর মতো
আনন্দের নূপুর গ'ড়ে দেয়

—Se confondraient (১৯৪১)

ঘাসের যে-প্রয়োজন বৃষ্টির তার চেয়েও
আমাদের প্রেমের প্রয়োজন প্রেমের

—Pour l'exemple (১৯৪৫)

মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো কবিতায় প্রেমের মহিমা ও রহস্য ঝলমল ক'রে ওঠে:

শুধু একটি আদরে
আমি তোমাকে তোমার সমস্ত ঔজ্জ্বল্যে ঝল্‌কে তুলি।

দরকার ছিল একটি মুখ
পৃথিবীর সমস্ত নামে সাড়া দেবে।

—Premièrement (১৯২৯)

একটি নারী প্রতি রজনীতে
গূঢ় গোপন যাত্রা।

—L'Univers-solitude (১৯৩০)

অপরিহার্যভাবে এই কাব্যের অবস্থান হল বর্তমান মুহূর্ত, সময়ের ঢেউয়ের যে-শিখর এখনই উঠে এল আমাদের সামনে। এক সময় থেকে আর এক সময়ের দূরত্ব সে পরিভ্রমণ করে না, শুধু এক চূড়ায় আরোহণ করে এবং সেখান থেকে সব কালকে বেষ্টন করে। এল্যুয়ারের কবিতায় অনবরত এই ক্ষণের উৎসার, যেখানে কখনো কখনো অতীত ও ভবিষ্যৎ এসে মেলে কখনো বা শুধু ভবিষ্যতের একটা উজ্জ্বল রশ্মি এসে পড়ে, বিশেষত শেষের দিকের কবিতাগুলোয় যখন তিনি মানুষের মুক্তিপথ দেখেছেন সাম্যবাদে। স্থির জলের মধ্যে যেমন একটা লোষ্ট্র-পরিমাণ আলোড়নের বৃত্ত বড় হতে হতে সমস্ত বিস্তার জুড়ে ফেলে তেমনি এল্যুয়ারীয় মুহূর্ত ঘিরে ফেলে সমস্ত কাল সমস্ত স্থিতি। "হফমান" নর্তকীদের দেখে তিনি যে-কথা বলেন তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় মহাকাল নৃত্যের কথা :

তোমাদের নৃত্য আমার স্বপ্নের ভীষণ গহ্বর
আমি প'ড়ে যাই আর আমার পতন আমার জীবনকে চিরন্তন করে
তোমাদের পায়ের নিচে শূন্য ক্রমে বিশাল থেকে বিশালতর হয়
অপূর্বা কন্যারা, তোমরা আকাশের উৎসের উপর নাচো।

—Les Gertrude Hoffman girls (১৯২৬)

অনবদ্য প্রেমেরও সেই বিস্তার যার সীমা নেই কালের দিক থেকে, সীমা নেই জাগতিক অবস্থানের দিক থেকে, যার আন্দোলন আদি প্রকৃতির আন্দোলন :

বিশুদ্ধ জল আর সমস্ত পূর্ণতা আমরা নিয়ে যাই
মহাপ্লাবনের গ্রীষ্ম অভিমুখে
এক সমুদ্রের উপর যার আকার ও রং তোমার শরীরের
যা তার ঝঞ্ঝায় মুগ্ধ যে-ঝঞ্ঝা তাকে নতুন বেশে সাজায়।
যা খেয়ালী আতপ্ত
যা পরিবর্তমান আমার মতো।

—L'Entente (১৯৩৫)

এই একক প্রেম ও নির্জনতার কবি অবশেষে এসে মিশলেন জনতার কল্লোলে। কবিজীবনের শুরু থেকে তাঁর মরমিয়া ধ্যানে ছিল এক ভেদ-বিলুপ্তির জগৎ যেখানে সবই একাকার, বস্তু মানুষ, নারীপুরুষ, আপনপর, দিন রাত। সমস্ত বিরোধ জড়িয়ে এক স্থির অন্তর্লোকে যাত্রা। তাঁর সেই জগৎ উত্তীর্ণ হল সমাজ-চেতনার কঠিন ভূমিতে। আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত লাগে। কিন্তু একটু কাছ থেকে দেখলে দেখা যায়, এই পরিণতিতে কোনো আকস্মিকতা নেই, তা অস্বাভাবিক নয়। একজন ফরাসী প্রাবন্ধিক বলেছেন, এলুয়্যারের নির্জনতা ছিল সঙ্গের কামনা, রাত্রি ছিল দিনের আশা। কথাটা ঠিকই। স্পেন-যুদ্ধের সময় থেকে মানব-মুক্তির কথা অবশ্য বড় হয়ে উঠল তাঁর কাব্যে, কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর নির্জন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে মানবিকতার এক অন্তঃসলিল ধারা ব'য়ে এসেছে। ব্যক্তি-গত প্রেম ছিল তাঁর ধ্যানের বিষয়, কিন্তু তা কোনো কিছুকে অস্বীকার ক'রে নয়। প্রেমকে তিনি তার মুক্তির নির্যাসে সমগ্রভাবে ধরতে চেয়েছেন, খণ্ডিত ক'রে নয়। সুতরাং জীবন ও মানুষের প্রতি আত্মীয়তা তাঁর সত্তায় শিকড় মেলে ছিল। বরং তাঁর মতো ভালোবাসার কবি যদি মানুষের যন্ত্রণায় বিচলিত না হতেন, যদি অত্যাচারের বিরুদ্ধে না দাঁড়াতেন, তবে সেটাই আশ্চর্যের হত। প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক বিশ্বাস মানুষের প্রতি ভালোবাসারই নামান্তর। দুজন থেকে এলুয়্যার বহুতে পৌঁছেছেন এবং সেই বহুর সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন দুজনকে মিলিয়েছেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে এই পরিণতি পরিবর্তন নয়, সম্প্রসারণ। বলা যায়, তিনি তাঁর কাব্যের কতকগুলি অন্তর্নিহিত গুণকে আরো বেশি ক'রে প্রকাশ করলেন অথবা তাদের উপর আরো বেশি জোর দিলেন। ১৯৪৪ সালের **Le Lit La Table** গ্রন্থের **Critique de la Poe´sie** কবিতাটির কি জনক নয় ১৯৩২-এর **La Vie Imme´diate** গ্রন্থের ঐ একই নামের কবিতা? দুই কবিতার বক্তব্য মূলত অভিন্ন: মানুষের সুখ মানুষের জীবন কবি-বাক্যের চেয়ে বেশি দামী। তারও অনেক আগে ১৯১৮ সালেই তো তিনি লিখেছেন **Poe´mes pour La Paix,** যাতে আছে যুদ্ধশেষে স্ত্রীদের স্বামী ফিরে পাওয়ার আনন্দের গান। না, এলুয়্যারের দুই পর্যায়ের মধ্যে মন্তরের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু এ কথা দুই দিক থেকে সত্য। মানুষের কথা এবং সমাজচেতনা তাঁর শেষ পর্বে স্পষ্ট হয়ে উঠলেও তিনি পূর্বধারা পরিত্যাগ করেননি। হৃদয়ের

কথা বলা, প্রেমের গূঢ়তাকে প্রকাশ কথার চেষ্টা, অচঞ্চল এক কেন্দ্রের দিকে পদক্ষেপ, এ সবই রয়েছে সেখানে। সেই জন্যে নতুন অনেক কবিতা যদিও অর্থের দিক দিয়ে সরল হয়েছে, অনেক আবার আগের মতোই গূঢ় ব্যঞ্জনাময় থেকে গিয়েছে।

জীবনের দিক থেকে মুখ কখনো ফেরানো নয় এলুয়ার-এর। প্রেম ও জীবনকে তিনি এক ক'রে দেখেছেন একেবারে প্রথম আমলেই :

রাত্রিরা উষ্ণ আর শান্ত
আমরা ধ'রে রাখি প্রেয়সীদের কাছে
সবচেয়ে মূল্যবান এই বিশ্বস্ততা :
বাঁচবার আশা।

—Fide`le (১৯১৭)

এই সুরই বিস্তৃত হয়েছে পরে ; প্রেম আশা আনন্দ এক হয়ে গিয়েছে বাঁচায় :

আমি নিশ্চিত যে প্রতি মুহূর্তে
আমার প্রেমের আমার আশার
জনক ও সন্তান
আনন্দ আমার চিৎকারে উৎসারিত।

—Crier (১৯৪০)

প্রেম ও জীবন সমার্থক এই বোধ থেকেই সমস্ত মানুষের জীবনের জয়গান তাঁর কণ্ঠে। "কোন্ মুখ আসবে ঘোষণা করতে যে প্রেমের রাত দিনকে স্পর্শ করল"—এই প্রত্যাশা পরে বুঝতে পেরেছে যে "রাতই প্রস্তুত করছে এক অনন্ত দিন", অবশেষে দেখতে পেয়েছে সেই মুখ, মানুষের মুখ : "রাতকে মানুষ যেখানে দিন করে।"

মানুষ ও মানুষের জীবন স্পষ্টভাবে এসেছে তাঁর কাব্যে জীবনবিরোধী আক্রমণের মুখে। ১৯৩৬-এ তিনি পরিষ্কার বললেন : "ওরা জীবনকে উপেক্ষা করে, তার জন্যেই সর্বত্র আমাদের দুঃখ।" **Cours Naturel** (১৯৩৮) ও **Chanson Comple`te** (১৯৩৯)-এ এই সুর প্রশস্ত ও অদম্য হয়ে উঠল, যদিও তার পাশাপাশি থাকল, মিশে মিশে থাকল এক নিভৃত অনুভূতির ধারা, যা থাকল, থেকেই গেল বরাবর। মানুষ, মানুষের ভ্রাতৃত্ব,

অনিবার্য ভবিষ্যৎ ঐক্য সম্বন্ধে সহজ গভীর বিশ্বাস দেখা গেল Cours Naturel-এ। সমস্ত বস্তুর যেন এক রোমাঞ্চিত আবিষ্কারের সঙ্গে মিশে এই বিশ্বাস ব্যক্ত হল :

আমরা সকলে এক নতুন স্মৃতির সমীপে যাব
আমরা একত্রে এক অনুভবযোগ্য ভাষা বলব

*   *   *

আমি জীবন অভিমুখে যাচ্ছি আমার আকৃতি মানুষের
এ কথা প্রমাণ করবার জন্যে যে পৃথিবী আমার মাপে তৈরি
এবং আমি একা নই
আমার হাজার প্রতিরূপ আমার আলোকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়
হাজার অনুরূপ দৃষ্টি শরীরকে সমমূল্য করে
পাখি শিশু পাহাড় সমতল
আমাদের সঙ্গে মিশে যায়
গহ্বর থেকে উঠে এল ব'লে হাসি ঠিকরোয় সোনা
জল আগুন একটি ঋতুর জন্য উজাড় হয়
ব্রহ্মাণ্ডের ললাটে আর গ্রহণ নেই

*   *   *

হাত আমাদের হাতে চেনা হয়
ঠোঁট আমাদের ঠোঁটে মিশে যায়
প্রথম পুষ্প-উষ্ণতা
রক্তের স্নিগ্ধতায় বাঁধা
প্রাচুর্যময়ী উষা
প্রত্যেক ঘাসের চূড়ায় রানী
শ্যাওলার চূড়ায় তুষারের শিখরে
সব ঢেউয়ের সব বিপর্যস্ত বালুকণার
সব অদম্য শৈশবের শিখরে
সমস্ত গুহার ভিতর থেকে নিষ্ক্রান্তি
আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে নিষ্ক্রান্তি।

—Sans Age.

মানুষের রঙে সব কিছু রাঙানো। একটি কবিতায় তাঁর অভ্যস্ত পদ্ধতিতে তিনি দৃষ্ট ও অনুভূত সমস্ত জিনিষের নামকে মানুষের জীবনের বিবিধ বিশেষণে ভূষিত করছেন, তাদের একাকার করে দেখছেন মানুষের সঙ্গে, শেষে বলছেন : "সর্বনাশের গিঁটবাঁধা এইসব সম্পদ। একই রক্ত সমস্ত পৃথিবীর উপর।" স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে দেখছেন এলুয়ার মানুষকে যে-মানুষ মুক্তির পথে অগ্রসর, সেই সঙ্গে মানুষের মুখোশপরা শত্রুকেও, দেখছেন ঐক্যময় ভবিষ্যতের নির্মাণ বর্তমানের হাতে, দেখছেন সকলের সঙ্গে নিজেকে এক করে। এই আশা ভালোবাসা, এই একাত্মতা, মানুষের এই মহিমস্তব ছড়িয়ে পড়ছে কবিতায় কবিতায় :

মানুষ তার হাস্যকর অতীত থেকে মুক্ত হয়ে
তুলে ধরুক তার ভাইয়ের সামনে দোসর মুখ
আর যুক্তিকে দিক ভবঘুরে পাখা।

—Novembre 1936 (১৯৩৮)

সত্যিকার মানুষ যাদের জন্যে নিরাশা
আশার সর্বগ্রাসী আগুন জীইয়ে রাখে
এস একসঙ্গে খুলি ভবিষ্যতের শেষ কুঁড়ি।

—La Victoise de Guernica (১৯৩৮)

ঘাম আঘাত অশ্রুর তলার মানুষ
কিন্তু যারা তাদের সমস্ত স্বপ্নকে এইবার আহরণ করবে
আমি দেখি খাঁটি উৎসুক ভালো প্রয়োজনীয় মানুষ
মৃত্যুর চেয়ে শীর্ণ একটা বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দিল
আর সূর্যের কলরোলে ঘুমোল আনন্দে।

—Nous sommes (১৯৩৯)

আমাদের যৌবন পরম স্নেহে
প্রত্যূষকে জন্ম দেয় পৃথিবীর উপর।

—Poe`me perpe´tuel (১৯৩৯)

একটি মানুষ থাকবে
কিছু আসে যায় না সে কোন্ মানুষ

আমি বা অন্য কেউ
নইলে কিছুই থাকবে না।

—Le droit le devoir de vivre (১৯৪১)

আমরা অন্ধকারের চেলাকাঠ ফেলছি আগুনে
আমরা অবিচারের মরচে-ধরা তালা ভাঙছি
সেই সব মানুষ আসছে যারা আর নিজেদের ভয়ে সন্ত্রস্ত নয়
কারণ তারা সমস্ত মানুষ সম্বন্ধে নিশ্চিত
কারণ মানুষের মুখওয়ালা শত্রু অপস্রিয়মান।

—La dernière nuit (১৯৪২)

নারীর প্রতি প্রেম তাঁকে যেমন দুজনের মধ্যে ভিন্নতা রাখতে দেয়নি, সমস্ত বস্তুকে আঁকড়ে আপন-পরে এক হয়ে গিয়েছে, তেমনি মানুষের প্রতি প্রেমও স্থাবর-জঙ্গমে এক করে তাঁকে সকল মানুষের সঙ্গে মিশিয়েছে। এই দুই অবস্থানের মধ্যে সেই জন্য অভ্যন্তরীণ ঐক্য রয়েছে। নারীর প্রতি প্রেম তাঁকে নিজের ভিতর থেকে বের ক'রে এনেছে, নিষ্ক্রমণের পথ খুলে দিয়েছে, কারণ দান-প্রতিদানের তাগিদ তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছেন। নিজের মানুষী অস্তিত্বের মৌল আনন্দকে ধরতে গিয়ে বুঝেছেন নিজের আনন্দ যথেষ্ট নয়। তাই যুগলের পরে এসেছে সমষ্টি। নিজের ভিতরকার এই সামঞ্জস্যের প্রতি নিজেই তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন একাধিকবার। যেমন :

আমার বয়স আমাকে বরাবর দিয়েছে
নতুন যুক্তি অন্যের মধ্যে দিয়ে বাঁচবার
আমার হৃদয়ে অন্য এক হৃদয়ের রক্ত পাবার···
আমি আমাকে সম্পূর্ণভাবে গড়ি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে দিয়ে।

—Vivre (১৯৪০)

আমি বেঁচেছি এক ছায়ার মতো
তবুও সূর্যের গান গাইতে পেরেছি
সমগ্র সূর্য যে নিঃশ্বাস নেয়

প্রত্যেক বুকে আর সমস্ত চোখে
অকপটতার বিন্দু যা অশ্রুশেষে চকচক করে।

—**La dernie`re nuit** (১৯৪২)

ভালোবাসার পথ ধ'রেই তিনি বহুর ভাবনায় পৌঁছেছেন। যখন তিনি একক প্রেমে নিমগ্ন ছিলেন তখন যে-নিঃসঙ্গতাকে অনুভব করতেন তা আর কিছু নয়, প্রেমের অভাব। পরে এই নিঃসঙ্গতাকে যখন অন্যদের মধ্যে দেখেছেন তখন তাঁর প্রেমের ধর্মেই তাকে পরাভূত করতে উন্মুখ হয়েছেন। তাঁর কবিতার ভাষায়:

যেহেতু আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি
আমরা অন্যদের মুক্ত করতে চাই
তাদের বরফ-কঠিন নিঃসঙ্গতা থেকে।

—**Les sept poe`mes d'amourenguerre** (১৯৪২)

এল্যুয়ার-এর কাব্যে চড়া সুর প্রায় নেই-ই। কবিতায় তিনি কথা বলেন ধীরে ধীরে গাঢ় স্বরে, যা স্বগতোক্তির মতো শোনায়। তাঁর কাব্যের মেজাজের সঙ্গে এই স্বরের সম্পূর্ণ স্বভাবগত মিল। এত একটানা অনুচ্চ স্বর যে, তা একঘেঁয়ে মনে হতে পারে। কিন্তু কান পেতে শুনলে তার সম্মোহন আছে, বিশেষত ঐ একটানা অনর্গল ধ্বনির। তাঁর একটি গ্রন্থের নাম **Poe'sie Ininterrompue,** নিরবচ্ছিন্ন কাব্য। এ নাম তাঁর কবিকণ্ঠেরই এক প্রধান লক্ষণ।

ফরাসী প্রতিরোধ-কালের লেখা কবিতাগুলি অসামান্য সফলতা লাভ করেছে, সাহিত্য এবং পাঠকসাধারণ উভয় দিক থেকেই। অথচ ঐ সব কবিতায় এল্যুয়ার-এর ভঙ্গি ও স্বরের কোনো বদল হয়নি। এমনকি যেখানে তিনি ঘৃণা ও প্রতিশোধের মনোভাব প্রকাশ করেছেন সেখানেও উত্তেজনা নেই। তা যেন শান্ত তুষানল, পাপের বিরুদ্ধে অনির্বাণ। যেমন:

নির্দোষীর সমর্থনে প্রতিশোধের অভিলাষ
তার চেয়ে মূল্যবান মাণিক্য আর নেই।
যে-সকালে বিশ্বাসঘাতকরা মারা পড়ে
তার চেয়ে উজ্জ্বল আকাশ আর নেই।

যতদিন জল্লাদদের ক্ষমা করতে পারবে কেউ
ততদিন পৃথিবীতে কোনো উদ্ধার নেই।

—**Les Vendeurs d'Indulgence** (১৯৪৫)

"স্বাধীনতা", "গাব্রিয়েল পেরি", "সাঁঝবাতি" প্রভৃতি কবিতা অত সহজগতি, অত মৃদুভাষী হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত ফরাসীকে নাড়িয়েছে। মনে হয় ঐ কারণেই নাড়িয়েছে। ওসব কবিতা প্রত্যেকের কানে-কানে কথা বলেছে, যখন শুধু কানে-কানে কথা ব'লেই বাঁচার কথা বলা চলত। যে-ঘনিষ্ঠতা তাঁর কাব্যের প্রকৃতিগত সেই ঘনিষ্ঠতায় তিনি সকলের কাছে এসেছেন। তাই "স্বাধীনতা"র ছত্রগুলি ফরাসীরা দেবতার নামের মতো জপ করতে পেরেছে। কবির তদ্গত ভাবের সঙ্গে সর্বসাধারণের অনুভূতি একাত্ম হয়ে গেছে। বর্তমান কালে আরাগঁ এবং প্রেভের ছাড়া অন্য কোনো ফরাসী কবির রচনা এত দ্রুত ফরাসী পাঠকের চেনা হতে পারেনি, এমনভাবে ফরাসী-ভাষীর স্মৃতির পথ ধরতে পারেনি।

অথচ আশ্চর্য এই, এলুয়ার প্রতিরোধ-আমলে সর্বজনীন চেতনার আলোয় নেমে এলেও হৃদয়ের অস্ফুট রহস্যের জগৎ থেকে বিচ্যুত হলেন না। নতুন জগৎ যতই বর্তমান হোক, যতই স্পর্শগ্রাহ্য হোক, তা থাকল অন্তরের ছায়ায় ছায়ায় জড়ানো। কারণ তাঁর কাছে বাস্তব জগৎ অর্থময় এই জন্যে যে তা সব মানুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার উৎস, তা সব মানুষের হৃদয়ের কাছে কথা বলে। বোধ হয় এই বাস্তবই সত্যিকার বাস্তব বলে তাঁর সৃষ্টি মানুষের মনে এমনভাবে গ্রথিত হয়ে যায়। বোধহয় ঐ কারণেই তাঁর আপাতদুর্গম বাক্যপ্রবাহের মধ্যে এক একটা ছত্র সত্যের মতো অমর হয়ে যায়, সব অন্ধকারকে আলোকিত ক'রে তোলে।

নতুন পর্যায়ে এলুয়ার-এর রচনাপদ্ধতিরও কোনো মূলগত পরিবর্তন হয়নি: সেই এক এক করে সব দেখাশোনা জড়ো করা, সেই প্রতিতুলনার ছড়াছড়ি বিশেষ্যে বিশেষ্যে, বিশেষ্যে বিশেষণে, বাক্যে বাক্যে, সেই অদ্ভুত ও অপূর্ব চিত্রকল্পের প্রাচুর্য। তাঁর সমস্ত গঠনকার্যটা অনুষঙ্গের দ্বারা। প্রত্যেক শব্দকে তার ব্যবহার-মলিন অনুষঙ্গ থেকে মুক্ত ক'রে এক নতুন আবহাওয়ায় তুলে ধরতে তিনি তৎপর (এ প্রয়াস অবশ্য ফরাসী কাব্য-আন্দোলনে ঐতিহ্যগত এখন)। মূল কথাগুলিকে পরস্পরের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভাসিত করবার জন্যে

তিনি প্রায়ই ক্রিয়াপদ অন্বয়-শব্দ ইত্যাদি বাদ দেন, সামান্য ছেদচিহ্নের ব্যবধানও রাখেন না। এই কারণে তাঁর কবিতার ভাষান্তর অত্যন্ত দুরূহ। শব্দের নিজস্ব ধ্বনি এবং কবিতার অমিল পঙ্‌ক্তির ভিতরকার সূক্ষ্ম ওঠাপড়ার কথা তো ছেড়েই দিলাম। তাই অনুবাদে তাঁকে সব সময় চেনা যায় না।

একটা কথা অবশ্য ঠিক যে, এলুয়ার নব পর্যায়ে তাঁর কাব্যকে ক্রমশ বেশি ক'রে সরল ও অনাড়ম্বর করতে চেয়েছেন। কিন্তু এটাও এলুয়ারীয় পদ্ধতিরই পরিণতি। এই সারল্যের বীজ তাঁর কবিতায় আগেই ছিল। নিত্যব্যবহৃত সাধারণ শব্দের প্রতি তাঁর আদর লক্ষ্য করবার মতো। এই সব শব্দ প্রয়োগে তাঁর আনন্দ যেন কবিতার মধ্যে ছড়িয়ে যায়। এইরকম আনন্দ পেতেন একশ বছর আগের ঝেরার দ্য নের্ভাল। এ বৈশিষ্ট্যও এলুয়ার-এর কবিতা অন্য ভাষায় রূপায়িত করার অন্যতম বাধা। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিই। ফরাসী ভাষায় একটা সাধারণ ক্রিয়াপদ আছে : **tutoyer,** মানে 'তুমি' সম্বোধনে কথা বলা। যখন একে অপরের খুব ঘনিষ্ঠ হয়, আত্মীয়প্রতিম হয় তখন এই কথনরীতি চলে ফরাসীদের মধ্যে, যেমন আমাদের মধ্যে। "গাব্রিয়েল পেরি" কবিতায় এলুয়ার এই ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করেছেন অপূর্বভাবে : **Tutoyons-le···Tutoyons-nous**। এর অনুবাদ ইংরিজীতে অসম্ভব। বাংলাতেই বা কী হবে ? 'তুই-তোকারি করা তো অন্য ব্যাপার। ঘুরিয়ে অনুবাদ করা ছাড়া উপায় নেই, অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে এলুয়ারত্ব আর থাকে না।

কবি এলুয়ার-এর আরম্ভ, বিকাশ ও পরিণতি একটি স্বভাবের ধারায় সম্পূর্ণ। কবি-জীবনের প্রারম্ভে সুররেয়ালিস্ট আমলে তিনি নতুন কবিদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছিলেন : "একীভূত হবার শক্তিসম্পন্ন বাইরের বাস্তব ও ভিতরের বাস্তবকে এক হওয়ার পথে অগ্রসর দুটি মৌল বস্তু হিসেবে দেবার জন্যে আমরা তৎপর হয়েছি।" প্রকৃতপক্ষে এই তৎপরতায় তিনি কখনো ক্ষান্ত হননি এবং তাঁর মতো সার্থকও আর কেউ হননি। এই একত্বসাধনের একটি মন্ত্রই তাঁর ছিল এবং তাই-ই বোধ হয় একমাত্র মন্ত্র : ভালোবাসা। **Que voulez-vous, nous nous sommes aimès,** কী করব বলো,—আমরা পরস্পরকে ভালো-বেসেছি।

বোদলের এবং বোদলের-কাব্যের অনুবাদ

আত্ম-দর্শনেই বোদলের-এর শ্রেষ্ঠতা এবং বোদলের-এর শোচনীয়ত্ব। তাঁর আগে এমন ক'রে কেউ নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত হননি। কবিদের মধ্যে তিনিই যে প্রথম নিজের দিকে তাকালেন এমন নয়, অনেকেই তাকিয়েছিলেন, বিশেষত অব্যবহিত পূর্বের কবিরা। বস্তুত তাঁদের সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর সাদৃশ্য যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর মতো অনুসন্ধান তাঁদের ছিল না। আত্মকেন্দ্রিত দৃষ্টির পথে তিনি পৃথিবীর মুখ দেখার চেষ্টা করেন। কে আর এমন একাগ্র চেতনায় দুই জগৎকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন? অন্তরের রাজ্যে বোদলের-এর অন্বেষা ছিল যেমন সচেতন তেমন শ্রান্তিহীন। আবিষ্কারীর মতো। যে অন্ধকার অতলে নামতে ভয় করে, সেখানে নেমে তিনি তাঁর মানুষী প্রকৃতিকে উদ্‌ঘাটিত করেন এবং তাতে সব মানুষের প্রতিফলন দেখেন। এই স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন কবিতার মাধ্যমে, অতএব কবিতায় তিনি তাঁর পূর্ণ সত্তাকেই নিযুক্ত করেন। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, কবিতা এবং জীবন তাঁর কাছে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কবিতার এই নিরবচ্ছিন্ন একান্ত জীবন-সংযোগের রূপ বোদলেরেই আমরা প্রথম পেলাম। তিনিই দেখালেন, কবিতা রচনা এবং কবিতা ও জীবন সম্বন্ধে ভাবনা পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো। এক নতুন আদর্শ পরবর্তী কবিদের সামনে স্থাপিত হল। কবিতা যে এক উচ্চতম বৃত্তি এবং তার সঙ্গে যে অন্য কিছুর বিনিময় চলে না, এই ধারণা তিনি তাঁর চিন্তা ও জীবন দ্বারা সঞ্চারিত করেন। অর্থ, যশ, সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন; কবিতার প্রতি আনুগত্য বৈষয়িক আসক্তিকে তাঁর মনের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয়নি। যেহেতু কাব্য তাঁর কাছে খেলার বিষয় ছিল না, সেহেতু তার পদ্ধতি-প্রকরণ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। শব্দের মূল্য, প্রয়োগের যাথার্থ্য, ছন্দ, মিল ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ও পরিশ্রমের শেষ ছিল না। এও কবিকর্মীদের সামনে এক নতুন দৃষ্টান্ত।

বোদলের-এর কবি-স্বভাবে প্রধান প্রেরণা ইন্দ্রিয়ানুভূতির। তারই স্পর্শে চোখ খুলে তিনি নিজের ভিতরে তাকিয়েছেন। পৃথিবী তাঁর মধ্যে যে অনুরণন জাগিয়েছে তাও যেন তাঁর স্নায়ুরই অনুরণন। তাঁর কল্পনা হৃদয়োচ্ছ্বাসকে অবলম্বন ক'রে বিস্তৃত হয়নি। তিনি মূলত অনুভবের কবি। ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রখর ক'রে তিনি সমস্ত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন এবং জীবনের রহস্য অনুসরণ করেছেন। অনুভব-আশ্রয়ী কবিতার অন্যতম উদ্গাতা তিনি। শুধু তাই নয়; স্বপ্নপ্রয়াণে, অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যের উন্মোচনে এবং ভাষার যাদুকরী ক্ষমতার অনুধ্যানে তিনি কবি-শিল্পীর এক নতুন ভূমিকার ইঙ্গিত দেন। বাহ্য জগৎকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করার কথাও এই সঙ্গে তিনি বলেন। বস্তুপুঞ্জ এক গোপন সত্যের ব্যঞ্জনামাত্র, বর্ণ গন্ধ ধ্বনির মধ্যে মূলত কোনো ভেদ নেই, তারা এক আইডিয়ারই সঙ্কেত এবং কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ-গুলিকে উপমা হিসেবে ব্যবহার ক'রে অন্তরালবর্তী সত্যিকার জগৎকে উন্মোচিত করবে, এই তাঁর বক্তব্য। অবশ্য এ-সব বোদলের-এর মৌলিক কোনো চিন্তা নয়। একাধিক পূর্বগামীর চিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তিনি কাব্য ভাবনায় তা গ্রহণ ক'রে এবং কবির জীবন ও আচরণের সঙ্গে তা যুক্ত ক'রে এক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেন। দ্রষ্টার ভূমিকার জন্যে আকুল র‍্যাঁবোর পক্ষে তাই বোদলেরকে "প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা, এক সত্যিকার দেবতা" ব'লে উচ্ছ্বসিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

অতএব বিভিন্ন দিক থেকে বোদলের আগামী কাব্যের এক উৎসস্থল। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সব রকম নতুন কাব্য-প্রয়াসের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তিনি রেখে যান। বরং উল্টে এই কথাই বলা যায় যে, তাঁর সৃষ্টির সঙ্কীর্ণ মানস-পরিসরে ও-রকম দৃষ্টান্ত স্থাপন সম্ভবই ছিল না। তাঁকে পথপ্রদর্শক এই হিসেবে ধরা যায় যে, তাঁর চিন্তায় ও চেষ্টায় এমন কিছু কিছু বীজ ছিটিয়ে ছিল যা পরে বিভিন্ন কবিকর্মী আহরণ ক'রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বপন করেন এবং সযত্নে বড় ক'রে তোলেন। যে-সব মহীরুহ আকার নেয়, বোদলের নিশ্চয়ই তাদের কল্পনা করেননি। ভেরলেন, র‍্যাঁবো, মালার্মে এবং আরও পরে ভালেরি ও স্যুররেয়ালিস্টরা তাঁর কাছ থেকে যে-প্রেরণাই পেয়ে থাকুন, তাঁর সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান বিস্তর। তবু বোদলের কাব্যের নতুন পর্বের অর্থাৎ আধুনিক কাব্য ব'লে যাকে অভিহিত করা হয় তার প্রারম্ভ-সীমা। সেদিক থেকে তাঁর গুরুত্ব ঐতিহাসিক।

বোদলেয়র নিজের অন্তরে অবগাহন ক'রে যে-মানুষটিকে দেখেছিলেন এবং যার মুখের আদলে অন্য মানুষদের মুখ মিলিয়েছিলেন, সে-মানুষটি কিন্তু অসুস্থ। অবশ্য অংশত সে-অসুস্থতা নতুন যুগের এক নাগরিক অসুস্থতা। যুগের ছাপ তাতে আছেই। কিন্তু এও ঠিক—বোদলেয়র শরীরে ও মনে অসুস্থ ছিলেন। শিশুকাল থেকেই তাঁর স্নায়ু পীড়িত এবং তাঁর মন পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে তিক্ত ও অস্থির। পরস্পরের প্রতিক্রিয়ায় এরা আরও জর্জর হয়েছে। অনিয়মে ও ব্যাধির আক্রমণে শরীর ভেঙে পড়েছে। মন নানান উদ্ভাবনে বার বার উদ্ধার খুঁজেছে, আর ব্যর্থ হয়ে শুরু করেছে আত্মনিগ্রহ অথবা এক সঙ্কীর্ণ বিদ্রোহ। তাঁর বাক্যে ও বেশভূষায় অন্যকে বিস্মিত করবার, সন্ত্রস্ত করবার যে-প্রবণতা দেখা যেত, তা অংশত এই বিদ্রোহের একটা প্রকাশ মনে হয়। কবি ব'লে তাঁর মধ্যে স্বভাবগত উদ্দীপনা ছিল; কিন্তু তারই সঙ্গে উল্টোপিঠে ছিল এমন এক জীবন-বিমুখতা যা স্বাভাবিক নয়। "শৈশবেই আমার হৃদয়ে আমি দুই বিরুদ্ধ ভাব অনুভব করেছি: জীবনের বিভীষিকা এবং জীবনের উন্মাদনা। বিচলিতস্নায়ু নিষ্কর্মার চরিত্র এটা।"—এ তাঁর নিজেরই কথা। শেষ পর্যন্ত অস্বাভাবিকতা যেন তাঁর এক বিলাসেই দাঁড়িয়েছিল। মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে তাঁর ডায়েরীতে তিনি লেখেন: "আমার হিস্টিরিয়াকে আমি উপভোগের সঙ্গে এবং সন্ত্রাসের সঙ্গে বর্ধিত করেছি।"

তাঁর কবি-সত্তা অবশ্যই স্বপ্নের জগতে উত্তরণ চেয়েছে। তাঁর অলস উপভোগ-বাসনার সঙ্গে সমঞ্জস এক আশ্চর্য দেশের কল্পনা তিনি করেছেন। সুন্দরকে অন্বেষণ করেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি, জীবন তাঁকে শূন্যতার বোধই দিয়েছে। তাঁর মনের ভিতরকার বিভীষিকা ও নৈরাশ্য তাঁকে আরও বেশি চেপে ধরেছে। তিনি জীবনের রহস্য সন্ধানে বেরিয়ে নিজের অন্তরে এবং মানুষের অন্তরে দেখেছেন পাপের রাজত্ব। দেখেছেন, শয়তান সুতো ধ'রে আমাদের সকলকে নাচাচ্ছে। আদি পাপের বোধে তাঁর মন আচ্ছন্ন ছিল, অথচ শয়তানের হাত থেকে পরিত্রাণের সম্ভাবনা তিনি দেখেননি। এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি পাপের আলিঙ্গনে নিজেকে আরও ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সে-আলিঙ্গনের মধ্যে জ্ঞান হারাতে চেয়েও তিনি জ্ঞান হারাননি। বোধলুপ্তি তাঁর কখনও ঘটেনি। অনুভূতির পাশাপাশি অপ্রমত্ত বুদ্ধি সব সময়ই তার মধ্যে বাস করেছে। বিকৃত অস্তিত্বের দৃশ্য বার বার তাঁর মনশ্চক্ষুর

সামনে এসেছে। প্যারিসের নগর-জীবনের যে অংশ কাতর, মলিন, বিকৃত, তা স্বভাবতই তাঁর সৃষ্টির একটা পটভূমি হয়েছিল। এ রকমভাবে বাঁচলে এক ধরনের মানসিক অকাল-বার্ধক্য অবশ্যম্ভাবী (পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তিনি শরীরেও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন)। তাঁর কবিতায় তাই পড়ি: "আমি এক বর্ষণ-ক্লিষ্ট দেশের রাজা, ধনী. কিন্তু ক্ষমতাহীন, যুবক তবু অত্যন্ত বৃদ্ধ।" (Spleen-৩)।

অতএব জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা আসা অস্বাভাবিক নয়, বরং অনিবার্য। এই বিতৃষ্ণা তাঁর কাব্যে ওতপ্রোত। এ এক শোচনীয় মানসিক অবস্থা যা তিনি তাঁর কাব্যে অসাধারণ ক্ষমতায় চিত্রিত করেছেন। অনীহা ও বিষাদ তাতে অবশ্যই আছে, কিন্তু তিক্ততাও আছে। এবং উগ্রতা তা থেকে দূরে নয়। তাঁর 'Ennui-র ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় তাঁর Spleen, যাকে একজন ফরাসী সমালোচক "নিশ্চল উগ্রতা" ব'লে বর্ণনা করেছেন। তাঁর নৈরাশ্য এবং বিক্ষোভের অবস্থান পাশাপাশি।

বোদলের-এর ট্র্যাজিডি হল এই যে, এ অবস্থা থেকে তিনি নানা উপায়ে উদ্ধার পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পাননি। প্রণয় ও যৌনতা, নেশা ও স্বপ্ন (আমার মনে হয়, এমনকি তাঁর ভড়ংগুলোও) যেন তাঁর অভ্যন্তরীণ শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলাকে ভুলবার চেষ্টা। তাঁর জীবনযাত্রায় ও কাব্যে এ চেষ্টার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। তিনি সফল হননি, কারণ তাঁর বুদ্ধি ও চেতনাকে তিনি ঘুম পাড়াতে পারেননি। **La Fontaine du Sang** কবিতায় তার স্বীকৃতি অকপট। ঘুরেফিরে তিনি নিজের অস্তিত্বের দৈন্যকে দেখেছেন, যাকে মানুষেরই অস্তিত্বের রূপ ব'লে তাঁর মনে হয়েছে। পরিচিত পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছেন: "যেখানে হোক, যেখানে হোক, এই পৃথিবীর বাইরে।" অজানায় ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে অস্থির হয়েছেন। অবশেষে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়েছেন মৃত্যুর দিকে: "হায় মৃত্যুই সান্ত্বনা, সে-ই বাঁচায়। সে-ই হল জীবনের লক্ষ্য।" (**La Mort des Pauvres**)। তাঁর কাব্যে মৃত্যু এক আচ্ছন্নতার মতো বিরাজমান। কিন্তু মৃত্যুর বিস্ময় তাঁকে আকৃষ্ট করলেও শেষ পর্যন্ত তা আর বিস্ময় থাকে না। কল্পনায় তার পরেও নিজের চেতনা ও স্মৃতি জেগে থাকে। এই চরম দুর্ভাগ্যের অভিব্যক্তি **Le Rêve d'un Curieux**। এর পরে আর কী থাকতে পারে, ঘুরে ফিরে সেই জীবনের গহ্বরে মাথা কোটা ছাড়া?

বোদলের-কাব্যে মহত্ত্ব যদি কিছু থাকে, তবে তা অন্য এক নতুন জীবনের জন্যে কবির আকাঙ্ক্ষায় নিহিত। যদিও এ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গতি কিছু নেই, তবু তার একটা ধ্বনি আছে তাঁর কাব্যে। শিল্পের শ্রেষ্ঠতা স্মরণ এবং শিল্পের মাধ্যমে এক অসামঞ্জস্যবিনাশী মহত্তময় ঐক্যে উপনীত হওয়ার কল্পনা তার সঙ্গে যুক্ত। বাঁচবার জন্যে তাঁর প্রয়াসের সেই চিহ্নও ইতস্তত কিছু আছে। আর আছে কয়েকটি কবিতায় বিধুর গাম্ভীর্যে এক ক্ষণিক প্রশান্তির স্বর। ঐটুকুই আলো। নইলে তাঁর কাব্যের আবহাওয়ায় হাঁপ ধ'রে আসে। গহ্বর ও কারাগারের অস্তিত্ব সেখানে সর্বব্যাপী। পাপবোধে, শয়তানের লীলায়, যৌনতা-জড়িত বিক্ষেপে, অবসাদে, বিতৃষ্ণায় এবং এক মুক্তিহীন বিকারগ্রস্ততায় জীবনের রূপ সেখানে অভিভূত। তাছাড়া তাঁর কাব্যে পরিসরের স্বল্পতা এবং পুনরাবৃত্তি ক্লান্তিও আনে। কিন্তু তাঁর কবি-শক্তিকে অস্বীকার করা অসম্ভব। পরন্তু তাঁর শক্তির কারণেই তাঁর সৃষ্টি আরো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এক যন্ত্রণা-জর্জর মানুষকে প্রত্যক্ষ ক'রে যন্ত্রণা পাই। নিজের প্রতিরূপে যে-মানুষকে তিনি এঁকেছেন, সে সম্ভোগে ও বিতৃষ্ণায় সদাবিক্ষিপ্ত, ঈশ্বরে উন্মুখ হয়েও শয়তানের দ্বারা কবলিত। এই রূপ একটা অবস্থায় সত্য হলেও হতে পারে, কিন্তু বোদলের তাকে অনারোগ্য এবং ভবিষ্যৎহীন ক'রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আধুনিকতার আদি কবির চোখে এই মানুষ। কিন্তু সে নিশ্চয়ই অবক্ষয়ের মানুষ। সেই মানুষকে তিনি বিসূচিকা-রোগীর অন্তিম চেতনার মতো প্রখর চেতনা নিয়ে এঁকেছেন এবং সেটাকেই জীবনের রূপ ভেবেছেন। তাঁর এই চেতনায় আশ্চর্য না হয়ে আমরা পারি না। কিন্তু জীবনের রূপ?

বোদলের-কাব্য সাধারণভাবে আজ আমাদের ভাবনা-সংলগ্ন হতে পারে না। মানুষের সত্তা অপ্রতিকার্যভাবে দূষিত, এই উপলব্ধি তার ভিত্তি এবং গহ্বর ও শূন্যতার অনুভব তার আধার। এ উপলব্ধি ও অনুভবকে সম্বল ক'রে বাঁচা মানে না-বাঁচা। (বোদলের আরো বাঁচলে তাঁর কাছে কবিতা লেখারই কোনো অর্থ কি আর বেশিদিন থাকত?) জীবনের দারুণ অস্থৈর্য ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আজ জীবনের আগ্রহ কম প্রবল নয়। তার উদ্যমও। বোদলের-এর আত্মপীড়িত পরিক্রমায় আমাদের উচ্ছলতা দূরে থাক, যন্ত্রণারও প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাব না। কিন্তু ইতিহাসের পটে সাহিত্যের বিবর্তনে এ কাব্যের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এ কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমাদের

অবশ্যই উচিত। শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রায় সম্পূর্ণ বোদলের-কাব্য (পদ্য) বাংলায় অনুবাদ ক'রে সেই পরিচয় ঘটালেন। এজন্যে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য। তবে বোদলের সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিকোণ পৃথক। স্পষ্টতই তিনি বোদলের-এর একান্ত ভক্ত। তাঁর ভূমিকা পড়লে মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত কাব্যে বোদলেয় যেন উচ্চতম শিখর, যেন তা আমাদের সামনে এক চূড়ান্ত আদর্শ। এই কাব্যে যা কিছু লক্ষণ আছে সবই যে সাহিত্যের মহালক্ষণ তা বোঝানোর জন্যে তিনি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক শ বছর আগেকার অবক্ষয়-ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করা কি সম্ভব? তবে এটা বলা উচিত যে বোদলের-এর নিঃশর্ত প্রশস্তিতে বুদ্ধদেব বসু একক নন। নানা দেশের নানা সমালোচক তাঁর সঙ্গী। ভূমিকায় বোঁদলের ছাড়াও অন্য লেখকদের বিষয়ে এমন মন্তব্য আছে যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। যেমন, লা ফঁতেন সম্বন্ধে মন্তব্য। তাঁকে কি অত সহজেই বালক র‍্যাঁবোর জবানিতে অকবি ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায়? লা ফঁতেন-এর 'লিরিস্‌ম্‌' যাকে বলা হয় তা কি একেবারেই ভুয়ো? তিন শ বছর আগে যিনি এক আধুনিক ছন্দের সূচনা করেছিলেন, তাঁর শিল্পী-ক্ষমতা কি সাহিত্য-বিচারে খুব তুচ্ছ? আসলে বুদ্ধদেব বসু বলতে চান রোমান্টিক যুগের আগে ফ্রান্সে সত্যিকার কোনো কবিতাই লেখা হয়নি। মনে হয়, তিনি যেন উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কাব্যকলা ও কাব্যভাবনা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রত্যাশা করেন এবং তা না পাওয়ায় তিনি বিরক্ত। যাক, এ সব ভিন্ন প্রসঙ্গ। বোদলেরই বিবেচ্য।

বোদলের-এর বাস্তব উপস্থিতি তাঁর কবিতায়। সেটাই পাঠকদের কাছে সবচেয়ে বড় সত্য। তা থেকে তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। উপলব্ধি, প্রতিক্রিয়া, দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে। আনন্দের কথা এই যে, বুদ্ধদেব বসু বোদলের-এর উপস্থিতিকে বাঙালী পাঠকের ইন্দ্রিয়গোচর করলেন এবং বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ-শাখাকে পুষ্ট ক'রে বাঙালী সাহিত্য-অনুসন্ধিৎসুর জানার সীমানা বাড়িয়ে দিলেন। বোদলের-এর এতগুলি কবিতা (১০৮টি) অনুবাদ করতে যে-সময় ও পরিশ্রম তাঁকে নিয়োজিত করতে হয়েছে, তা সামান্য নয়। শুধু কবিতার অনুবাদই তিনি করেননি, বোদলের-এর জীবন ও কাল সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ক'রে লিখেছেন এবং বিভিন্ন কবিতার টীকা করেছেন। এই উদ্যম অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য।

২.

কবিতার অনুবাদ দুরূহ কাজ। তার সমস্যা অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ রূপ নিয়ে, যারা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মূল কবিতার বক্তব্য অবিকৃত রাখতে হবে এবং যথাসম্ভব তার আবহাওয়াও। সেই সঙ্গে তার গঠন এবং ভাষার বৈশিষ্ট্যকেও বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। এই সব বিষয়ে অবহিত থেকে কবিতার ভাষান্তর করলে তবে অনুবাদ সার্থক হতে পারে, অর্থাৎ মূলের একটা আস্বাদ পাওয়া যেতে পারে। এ কাজ কবি ছাড়া অন্যের দ্বারা সম্ভব মনে হয় না। কারণ শিল্পগত দক্ষতার প্রশ্ন তো আছেই, তা ছাড়াও আছে হৃদয়গত সহানুভূতির প্রশ্ন। যে-কবিতা অনুবাদ করব তার ভিতরে বাস করা দরকার, সাময়িকভাবে তার হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়া দরকার। যে কোনো অনুবাদেই এ প্রশ্ন আসে। আর সমগ্রভাবে কোনো কবিকে অনুবাদ করতে গেলে তো কথাই নেই। এদিক থেকে বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়-অনুবাদে স্বাভাবিকভাবে অধিকারী, বিশেষত যে কবির প্রতি তিনি অমন পরিপূর্ণরূপে শ্রদ্ধাবান।

ভাষার বদল ঘটাতে হয় ব'লে মূলের গঠন অনুবাদের এক দারুণ সমস্যা। এ সমস্যা মোটামুটিভাবে সমাধান করা ছাড়া উপায় নেই। ছন্দ ও মিল যেখানে আছে, যেমন বোদলেয়রে আছে, সেখানে ছন্দ ও মিল রাখতেই হবে। কিন্তু মূলের ছন্দ ও মিল রাখার কোনো প্রশ্নই নেই, কারণ সে অন্য ভাষা। কেবল ছকটা রাখাই এ ক্ষেত্রে কর্তব্য, যাতে মূলের গঠনের একটা আভাস পাওয়া যায়। মূল ছন্দের একটা চলন যেন নিশ্বাসের আন্দাজেই রাখতে হবে। এবং মিলের ক্রমটা। ছন্দ ও মিল দিয়ে লিখতে গেলে মূলের কিছু শব্দ অন্য ভাষায় প্রতিশব্দ থাকলেও বাদ পড়বে এবং নতুন শব্দ কিছু বসবে। এ এড়ানো যাবে না। এ অবস্থায় কবিতার চরিত্রের পক্ষে অপরিহার্য কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যাতে বাদ না যায় এবং কবি-চরিত্রের সঙ্গে অসমঞ্জস কোনো ভাষাভঙ্গি না আসে, এই সাবধানতাটুকু প্রয়োজন। ধ্বনির সমস্যাও আছে। কিন্তু এক ভাষার ধ্বনি অন্য ভাষায় আর কী ক'রে আনা যাবে? মোটের উপর এই করতে পারি যে, গম্ভীর ধ্বনিকে ভাষান্তরে গম্ভীরই রাখব এবং লঘু ধ্বনিকে লঘু। এ বিষয়ে যথেচ্ছ আচরণ করব না। বলা বাহুল্য, শব্দ, মিল ও ছন্দ মিলিয়েই এই ধ্বনি। কবিতা বর্তমানে যে রূপ পরিগ্রহ

করেছে, তাতে আর এক ধরনের সমস্যাও দেখা দিয়েছে। বাক্যের ব্যাকরণগত অর্থ অনেক সময় স্পষ্ট না হওয়ায় অনুবাদ প্রধানত নির্ভর করে ভাষ্যের উপর। অর্থাৎ অনুবাদক কবিতার কী ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করছেন তার উপর। কিন্তু বোদলের-এর ক্ষেত্রে এ অসুবিধে নেই। কারণ বিশেষ কোনো শব্দের সংস্থাপন, চিত্রকল্প এবং ভাব তাঁর কবিতায় যে-রহস্যই সঞ্চার করুক না কেন, বাক্যের গঠন তা থেকে মুক্ত। তাঁর কাব্যে এমন জায়গা নেই বললেই চলে যেখানে ব্যাকরণগতভাবে তাঁর বাক্যের অর্থ করতে ক্লেশ হয়।

ভাষান্তরে অনেক সময়ই কবিতা আর কবিতা থাকে না, কতকগুলো শব্দের সমষ্টিতে দাঁড়ায়। বোঝা যায়, তা নেহাৎ অনুবাদ। বোদলের-অনুবাদে বুদ্ধদেব বসুর কৃতিত্ব এই যে, এতগুলো কবিতার তিনি পাঠযোগ্য রূপান্তর ঘটিয়েছেন। অনেক অনুবাদই কবিতার স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে। কিন্তু সেটাই সব নয়, এমনকি আসলও নয়। মূলের বৈশিষ্ট্য কতখানি থাকল, সে প্রশ্ন একান্তভাবে বিবেচ্য। কিছু অনুবাদ বাস্তবিকই ভালো। সেগুলোতে যেন মূল কবিতার স্পর্শ পাওয়া যায়, ধ্বনিতে এবং ভাবে। যেমন, 'পথ্য কবিতা,' ,শত্রু', 'সৌন্দর্য', 'সপ্রাণ মশাল', 'আধ্যাত্মিক উষা,' 'বিতৃষ্ণা,' 'আবেশ', 'এখনো ভুলিনি তাকে', 'মহাপ্রাণ সেই দাসী', 'পাতকিনী', 'সিথেরায় যাত্রা', 'শিল্পীদের মৃত্যু', 'গহ্বর' প্রভৃতি কবিতা। অবশ্য অনুবাদ ভালো হলেও কোনো কোনো জায়গায় মন সায় দেয় না, এমন হয়। কোথাও কোথাও পরিবর্তন হলে সর্বাংশে সুন্দর হত মনে হয়। কিন্তু এ মনে-হওয়াটা গুরুতর নয়। কোনো অনুবাদই বোধহয় অন্যের আশা সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারে না। এ গ্রন্থে এমন অনুবাদও আছে যা সমগ্রভাবে আকৃষ্ট না করলেও কোনো কোনো অংশে প্রশংসনীয়।

কিন্তু ব্যর্থ অনুবাদও যথেষ্ট। বোদলের-এর অনুবাদ সম্পর্কে কতকগুলো বিষয় মনে রাখতে আমরা বাধ্য। যথা, বোদলের শব্দের যাথার্থ্যকে অসাধারণ মূল্য দিতেন; ছন্দ ও মিলের গুরুত্বও তাঁর কাছে অসামান্য; তাঁর রচনা পরিষ্কার, বাক্যের গঠনে তাঁর বিন্দুমাত্র শিথিলতা নেই এবং প্রায়ই তা গদ্য-সুলভ, তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে 'কাব্যিকতা' নেই; পাঠকের অনুভূতির কাছে তাঁর কবিতার যে-আবেদন তার অন্যতম নির্ভর বিশিষ্ট চিত্রকল্পে, এবং এ সবকে অবলম্বন ক'রে তাঁর নিরুচ্ছ্বাস আবেগ তাঁর কবিতায় এক অদ্ভুত তীব্রতা সঞ্চার

করে। দুঃখের বিষয়, বর্তমান অনুবাদে অনেক ক্ষেত্রেই এ সব বিষয় বিবেচনা করা হয়নি।

যেমন ধরা যাক, প্রথম কবিতা 'পাঠকের প্রতি'। মূল কবিতা সনাতন ফরাসী ছন্দ 'আলেক্‌সাঁদ্র্যাঁ'-তে, অর্থাৎ মোট বারোটি স্বরধ্বনির এক একটি ছত্র। এই সনাতন ছন্দ বোদলের-এর অতি প্রিয়। এ ছন্দকে বাংলায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ছত্রের অক্ষরবৃত্তে রূপান্তরিত করাই বাঞ্ছনীয়। এবং বুদ্ধদেব বসু বহু কবিতায় তাই-ই করেছেন। কিন্তু এ কবিতায় করেননি। হ্রস্ব ছত্রের মাত্রাবৃত্তে মূলের চলনই নেই এবং শব্দের কায়দায় এ কবিতা প্রায় মৌলিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। "জঘন্য সব বস্তু আমাদের কাছে আকর্ষণীয়", এই সরল বাক্যকে যদি করা হয় "বীভৎসে বাঁধি রমণীয় নির্বন্ধে", তাহলে কাব্যিক হয় বটে, কিন্তু বোদলেরকে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে, এ কবিতাটি পড়লে মনে হয় যেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তীয় কোনো আধুনিক বাংলা কবিতা পড়ছি। ছন্দ বহু কবিতায় এই রকম পাল্টানো হয়েছে। যদি মূলের কোনো ছন্দকে বাংলায় একটা বিশেষ ছন্দে ঢালি, তাহলে সেই মূল ছন্দ যেখানে যেখানে আছে, সেখানেই সেই বাংলা ছন্দ ব্যবহার করা কর্তব্য। নইলে মূল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় এবং তার মেজাজও ধরা যায় না।

আমার বিশ্বাস, অনুবাদে ব্যর্থতা যা ঘটেছে, তার কারণ প্রকৃত সহানুভূতির অভাব। নইলে মূল ছন্দের গতিকে বাতিল করা হবে কেন, কেনই বা চিত্রকল্প পাল্টে দেওয়া হবে অথবা ঋজু উক্তিকে ভাষার কৃত্রিমতায় দুর্বোধ্য ক'রে তোলা হবে? এ সবের ফলে অনেক কবিতা বোদলেরীয় চারিত্র্য পায়নি। যেমন, Le'the'-র রূপান্তর কি মূলের' তীব্রতাকে একটুও আভাসিত করে? "শুধু তোর শয়ন-'পরে আমার এ-কান্না ঘুমোয় / খোলা ঐ গন্ধে ডুবে কিছু বা শান্তি লোটে;" কিম্বা "নিয়তির চাকায় বাঁধা নিরুপায় বাধ্য আমি, / নিয়তির শাপেই গাঁথি ইদানীং ফুল্ল মালা;" (লিথি)—এ রকম প্রকাশভঙ্গি বোদলের থেকে সুদূর এবং কথাগুলো মূলের বক্তব্যও যথাযথ বহন করেনি। ইমেজ নষ্ট ক'রে দিলে কবিতার বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য কতখানি অবশিষ্ট থাকে? "এই হৃদয়ের ডুবে মরার অতল হ্রদ···/এগিয়ে মাথা ঝাঁপিয়ে পড়ি,/স্বপ্ন মেটে, দীর্ঘশ্বাসের দেনাও রদ।" (কয়েকটি বিষ)—ঈপ্সিতা রমণীর চোখ সম্পর্কে এই ছত্রগুলো প'ড়ে কি আন্দাজ করা যায়, বোদলের বলেছেন: **Lacs ou' mon ame tremble et se voit a'**

l'envers···/ Mes songes viennent en foule/Pour se dé'salterer a' ces gouffres amers. [হৃদ যেখানে আমার আত্মা কাঁপে এবং নিজেকে উল্টো দেখে···ঐ তিক্ত* গহ্বরে তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে আমার স্বপ্নেরা ভিড় ক'রে আসে] ?

অনুবাদ যদি মূলের শব্দ, বাক্য ভঙ্গি, এমনকি উক্তিকেও অনুমান করতে না দেয় তাহলে অনুবাদের সার্থকতা কী ? দুয়ের মধ্যে বিভ্রান্তিকর বিভেদ নানা জায়গায় আছে। যদি **bistre' comme la peau d'un bonze** [বৌদ্ধ ভিক্ষুর ত্বকের মতো খয়েরী]-কে করা হয় "বৌদ্ধের মতো স্বপ্ন ভরা" (একটি মুখের প্রতিশ্রুতি) কিম্বা—**a' quoi bon chercher tes beaute's langoureuses/ Ailleurs qu'en ton cher corps et qu'en ton coeur si doux** ? [তোমার প্রিয় শরীরে এবং তোমার মধুর হৃদয়ে ছাড়া অন্যত্র তোমার মদালস সৌন্দর্যকে খুঁজে লাভ কী ?]-কে করা হয় "আর কোথা খুঁজে পাই লাস্যময় তোমার রূপেরে / যদি না তোমার প্রাণ সুন্দর তনুতে রয় গাঁথা" (বারান্দা) কিম্বা **Et qui···pre'fe'rerait/ La douleur a' la mort et l'enfer au ne'ant.** [যারা মৃত্যুর চেয়ে যন্ত্রণাকে বরণীয় মনে করবে এবং শূন্যতার চেয়ে নরককে।]-কে করা হয় "শূন্যতার যে কোনো অন্যথা খুঁজে সর্বস্বান্ত যারা / হোক তা যাতনা মৃত্যু নরকের অনন্ত পাতাল।" (জুয়ো), তাহলে বিস্মিত না হ'য়ে উপায় কী ? "হে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার" (স্তোত্র) শুনতে বেশ সুন্দর, কাব্যময়ও বটে, কিন্তু বোদলের ওরকম ভাবে মোটেই বলেননি, তিনি সোজাসুজি, প্রায় সাধারণভাবেই বলেছেন : "যে আমার হৃদয়কে আলোয় পূর্ণ করে"।

কবিতার অনুবাদে শব্দ ও বাক্যের পরিবর্তন এবং নানা গ্রহণ ও বর্জন অনিবার্য। কিন্তু এমন পরিবর্তন অনুচিত যার ফলে মূলের চারিত্র্য লুপ্ত হয়। পরিবর্তন সত্ত্বেও যে অনুবাদ বিশ্বস্ত হতে পারে, বুদ্ধদেব বসুই একাধিক জায়গায় তার নিদর্শন দেখেছেন। সব পরিবর্তন সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারলে খুশী হওয়া যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তিনি প্রায়শ যে-ধরনের স্বাধীনতা নিয়েছেন

---

* আক্ষরিক অর্থে 'তিক্ত'। ব্যঞ্জনা অনুসারে 'লবণাক্ত' বা অন্য কোনো উপযোগী শব্দ দেওয়া যেতে পারে। সমুদ্রের বিশেষণ হিসেবে ফরাসীতে অনেক সময় উক্ত শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

তাতে মনে এই সন্দেহ আসে যে, বাস্তবিক যথেষ্ট মমতা ও নিষ্ঠা নিয়ে তিনি বোদলের-এর কাছে যাননি। অবশ্য গোড়াতেই অনুবাদকের মন্তব্য পড়তে গিয়ে একটা খট্‌কা লাগে। তিনি বলেছেন, "এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে ইংরেজি ভাষায় আমি যতটা অভ্যস্ত ফরাশিতে ঠিক ততটা হলেও, আমার এই অনুবাদ-গুচ্ছ যা হয়েছে তা থেকে ভিন্ন কিছু হতো না।" আশ্চর্য উক্তি। এই কি শ্রদ্ধার মনোভাব? যে-কবির সমগ্র কাব্য অনুবাদ করছি, তাঁর ভাষা ভালো জানা এবং ভালো না-জানার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে ব'লে মনে না করা? যাই হোক, আমার কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বুদ্ধদেব বসু ইংরেজীর মতো ফরাসী জানলে অনুবাদ আরো ভালো হত, ইংরিজীর তর্জমাগুলো তিনি আরো ভালো ক'রে যাচাই করতে পারতেন, অন্তত যে-ধরনের সব ভাষাগত ভুল তিনি করেছেন তা করতেন না। বিদেশী ভাষার অনুবাদে ভুল হওয়া খুবই সম্ভব, ভালো জানলেও হয়। কিন্তু ভুলের সম্ভাবনাকে আমল না-দেওয়াটা খুব আশ্চর্যের। এখানে কয়েকটি ভুলের উল্লেখ করছি:

প্রথমেই বোদলের-এর কাব্যগ্রন্থের নাম। **Fleurs du Mal** 'ক্লেদজ কুসুম' হবে কেন? এক্ষেত্রে অবশ্য ফরাসী ভাষাজ্ঞানের প্রশ্ন ততটা নেই যতটা আছে বিবেচনার প্রশ্ন। ক্লেদ জন্মালেও কুসুম খুব ভালো হতে পারে। পদ্মের নাম তো পঙ্কজ। কিন্তু ফুলগুলো খারাপ এই অর্থেই বোদলের নামকরণ করেছিলেন। 'বিষাক্ত', 'অসুস্থ,' এ সব বিশেষণ তিনি নিজেই প্রয়োগ করেছেন। প্রচ্ছদপট প্রসঙ্গে তাঁর যে-বর্ণনা আছে তা থেকেও এ নামের তাৎপর্য বোঝা যায়। অতএব 'ক্লেদজ কুসুম' ঠিক নয়।

La Ge´ante (দানবী) কবিতায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার অতীতের কল্পনায় কবির মনের অভিলাষকে ব্যক্ত করেছে। কিন্তু অনুবাদে তা ঘটনা হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

'তবু অতৃপ্তা'য় শেষ স্তবকটির যে-অর্থ পাই, মূলের অর্থ তার বিপরীত। "তোমার শয্যার নরকে আমি প্রসার্পিনা হতে পারি না", এই উক্তি অনুবাদে দাঁড়িয়েছে: "যেহেতু নরক তোর শয্যা আর আমি প্রসার্পিনা।" শয্যার নরকে প্রসার্পিনা হতে না পারার আক্ষেপ থেকেই সমালোচকরা বোদলের-প্রণয়িনী ঝান দ্যুভাল-এর সমকামী প্রবণতা অনুমান ক'রে থাকেন।

ফরাসীতে lubricite'-র অর্থ কামুকতা। তাকে করা হয়েছে: পিচ্ছিলতা। ফলে, যে-বাক্যাংশের অর্থ "কামুকতার সঙ্গে সরলতা যুক্ত হয়ে", তা অনুবাদে দাঁড়িয়েছে: "সরলে পিচ্ছিলে মেশা" (অলংকার, চতুর্থ স্তবক)। এই কবিতারই ষষ্ঠ স্তবকের la এবং elle শব্দ দুটিকে প্রেয়সীর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু ও দুটি শব্দ "আমার আত্মা"র সর্বনাম। ফরাসীতে ame স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। স্বভাবতই স্তবকটি অনুবাদে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। Lubrique মানে কামুক। 'এক শব' কবিতায় femme lubrique-এর অনুবাদ পড়ি "আর্দ্র নারী"!

'আলোকস্তম্ভ' কবিতার পঞ্চম স্তবকে পড়ি: "চোর, গুণ্ডা, পাণ্ডুরোগী, মদস্ফীত হৃদয় বিরাট—/এদেরই অন্তর ছেনে করেছেন সৌন্দর্যচয়ন/প্যুজে ..."। মূলের শব্দ-সম্পর্ক কিন্তু এ রকম নয়। সেখানে "পাণ্ডুরোগী" এবং "মদস্ফীত হৃদয় বিরাট" প্যুজের বিশেষণাত্মক।

ফরাসীতে n'importe ou' মানে: যে কোনোখানে। সুতরাং Voyage কবিতায় n'e'tant nulle part, peut etre n'importe ou'-র অর্থ: "কোথাও নেই ব'লে যে, কোনোখানেই থাকতে পারে।" কিন্তু অনুবাদে পাই: "কোথাও তা নেই তাই মনে হয় নেই কোনোখানে।" (ভ্রমণ, দ্বিতীয় অংশ, দ্বিতীয় স্তবক)।

Sois sage, O ma Douleur—"হে আমার দুঃখ তুমি প্রাজ্ঞ হও" (আত্মহতা), এই অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত ক'রে অনুবাদক ভূমিকায় বোদলের-এর দুঃখের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য এবং তার দ্বারা প্রজ্ঞালাভের কথা বলেছেন। Sage-এর বাচ্যার্থ অবশ্যই বিজ্ঞ বা প্রাজ্ঞ। কিন্তু ফরাসী মা অস্থির ছেলেকে বলেন: Sois sage অর্থাৎ "ছটফট কোরো না, দুরন্তপনা কোরো না, লক্ষ্মী হয়ে থাকো।" বোদলের সেই অর্থেই শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। শান্ত হয়ে থাকার কথা পরবর্তী বাক্যাংশে আছেও।

অনুবাদ শেষে যে তিনটি গদ্য-অংশ যোগ করা হয়েছে সেগুলো খুব প্রয়োজনীয়: কবিতার টীকা, কালপঞ্জী এবং বোদলের-এর জীবনপঞ্জী। প্রথমটিতে লেখক বিভিন্ন কবিতার অন্তর্গত পৌরাণিক উল্লেখগুলো ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোনো কোনো কবিতার জন্ম-বৃত্তান্ত দিয়েছেন। দ্বিতীয় অংশটিতে বোদলের-এর পূর্ববর্তী, সমসাময়িক এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন, যাতে এক বিস্তৃত পটভূমিতে তাঁকে দেখা যায়। তৃতীয় অংশটিতে

বোদলের-এর জীবনের অতি বিশদ বিবরণ তিনি দিয়েছেন। এই যোজনার ফলে কবির এবং তাঁর সৃষ্টির সম্যক পরিচয় লাভ পাঠকের পক্ষে সহজ হবে। তবে আমার মনে হয়, কবিতার টীকা অংশ বাড়ালে আরো ভালো হত। অনেক ক্ষেত্রেই কবিতার কেন্দ্রীয় ভাব বা মূল বক্তব্য কী তা পাঠককে জানানোর প্রয়োজন ছিল। সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে বোদলের-কাব্যের বিশদ পরিচয় দেওয়া যখন লেখকের উদ্দেশ্য, তখন কবিতাগুলো অনুধাবনে তাকে আরো সাহায্য করা উচিত। কয়েকটি কবিতার দু-একটি ছত্রের মহিমা সম্বন্ধে অন্যের অভিমত এবং কোনো কোনো কবিতাপ্রসঙ্গে অন্যের কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য অনেক কবিতার বা ছত্রের তাৎপর্য কেন ব্যাখ্যা করা হয়নি বোঝা যায় না। কবিতার টীকা আরো বেশি দিতে গেলে অবশ্য জায়গা আরো বেশি লাগত। কিন্তু সে জায়গা অনায়াসেই করা যেত অনেক অবান্তর জিনিস ছাঁটাই ক'রে। সব অংশ থেকেই। যেমন, টীকার মধ্যে নের্ভাল-এর কবিতার ফরাসী উদ্ধৃতির কী আবশ্যকতা ছিল? (উদ্ধৃত শেষ ছত্রে দুটি ভুল আছে)। কিংবা 'সিথেরায় যাত্রা' বোঝবার জন্যে কি এ কথা জানা দরকার যে, "কবিতাটির রচনাকালে কবির উপদংশের প্রকোপ উগ্র হয়ে উঠেছিল"? ভেরলেন সম্পর্কেও এই রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যদের বেলায়ই বা কেন করা হয়নি তা বুঝলাম না। মানসিক ও শারীরিক রোগ-বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বোদলের প্রসঙ্গে উপদংশের ভূমিকা উল্লেখ করেন এবং বোদলের-বিরোধীরা এই রোগের কথা তাঁদের পক্ষের একটা যুক্তি হিসেবে দাঁড় করান। কিন্তু সে সব মত লেখকের কাছে গ্রাহ্য হবে ব'লে মনে করি না। কোনো কোনো কবিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে, অথচ অন্যগুলো সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি অথবা যেটুকু বলা হয়েছে তা অন্যত্র বিক্ষিপ্ত। সব তথ্য গুছিয়ে পর পর টীকায় সন্নিবিষ্ট করলে পাঠকের উপকার হত।

কালপঞ্জী দিয়ে রচনাকে ও রচয়িতাকে একটা পটভূমিতে স্থাপন করার রেওয়াজ ওদেশে প্রচলিত, বিশেষত ফ্রান্সে। বাংলা দেশে সেই ভাবে কোনো বিদেশী লেখককে উপস্থিত করার উদ্যম বোধহয় এই প্রথম। অভিনন্দনীয় উদ্যম সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে হল লেখক ধ'রে নিয়েছেন, সাধারণ বাঙালী পাঠকরা (যাঁদের উদ্দেশে এই গ্রন্থ) ইওরোপীয় সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। প্রকৃতপক্ষে আমরা তা নই ব'লে পদে পদে ধাঁধাঁ লাগে; মনে

হয়, এই উল্লেখটার কী সার্থকতা। এবং কোনো কোনো উল্লেখের টীকার প্রয়োজন অনুভব করতে হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মঁতেসকিউর মৃত্যু অথবা ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গইয়ার বধির হওয়া, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বেটোফেনের বধির হতে আরম্ভ করা ও ৮১-তে সম্পূর্ণ বধির হয়ে যাওয়া অথবা ১৮৭৬-৭৮-এ মনে-র 'সাঁ লাজার' চিত্রাবলী অথবা ১৮৯৪-তে ট্রেনে 'ইয়েলো বুক' পড়তে পড়তে অস্কার ওয়াইল্ডের তা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া অথবা ১৯০৬-এ পিকাসো ও মাতিস-এর সাক্ষাৎ ইত্যাকার উল্লেখে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি

বোদলের-এর জীবনী অংশটি সব চেয়ে বিস্তৃত। তাঁর জীবন ও কাল সম্বন্ধে কোনো তথ্য দিতে লেখক কার্পণ্য করেননি। এ জন্যে শুধু বোদলেরকে নয়, তখনকার সমগ্র আবহাওয়াকে পাঠক জানতে পারে। এ অংশ অবশ্য আরও সংহত হতে পারত। বিশেষত মাঝে মাঝে লেখকের যে সব মন্তব্য আছে তা না থাকলেও চলত। বরং না থাকলে পাঠক অবিক্ষিপ্ত মনোযোগে বোদলের-এর জীবন অনুসরণ করতে পারত। জায়গাও বাঁচত। আমি বলছি এই রকম সব মন্তব্যের কথা যেমন: "পিতার অর্থ ও মাতার অর্থের অস্তিত্ব সত্ত্বেও দারিদ্র্যের চরমে নেমে বোদলেয়ারকে মরতে হ'লো। কী লাভ হ'লো কার? কার ভালো করা হ'লো? যদি বোদলেয়ার দশ বছরে—বা পাঁচ বছরেও—তাঁর পুরো মূলধন উড়িয়ে দিতেন, তাহ'লেও কি এর চেয়ে বেশি কষ্ট পেতে হ'তো তাঁকে? তাহ'লে, দরিদ্র হ'য়েও অন্তত নিজের টাকা নিজে ভিক্ষে ক'রে নেবার গ্লানি তাঁকে সইতে হ'তো না। কিংবা, হয়তো, কোনো উপায় নেই দেখে, উপায়হীনতার মধ্যেই বাঁচতে শিখতেন—ভের্লেনের মতো। ...মনে হ'তে পারে, যে-কোনো অবস্থার মধ্যে তিনি তাঁর কাজ ক'রে গেছেন, আমরা পেয়েছি এক গুচ্ছ সৌন্দর্য ও পবিত্রতা—এখন এ-সব আলোচনা ক'রে লাভ কী। কিন্তু সত্যি কি কোনো লাভ নেই? যা হয়নি তা আমরা কখনোই ভাবতে পারি না; তাই বাধ্য হ'য়ে, যা হয়েছে তাকেই সম্পূর্ণ ব'লে ধ'রে নিই।"...ইত্যাদি (২৪০ পৃঃ); অথবা "সত্য সে [ঝান] শিক্ষিত ছিলো না, বোদলেয়ারের কবিতার মূল্য কিছুই বুঝতো না, কিন্তু তাতে কি কিছু এসে যায়? পৃথিবীতে ক-জন কবির ভাগ্যে এমন স্ত্রী বা প্রণয়িনী জুটেছে, কবিতার রসজ্ঞ হবার যার ক্ষমতা ছিলো?... যারা শুনবে বা বুঝবে তাদের আশায় ব'সে

থাকলে সৃষ্টি টিকতো না।" (২৬২ পৃঃ)। এ সব মন্তব্য গভীরতার জন্যে অপরিহার্য ছিল মনে হয় না।

প্রসঙ্গত বলি, এ গ্রন্থের গদ্যে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি অনুভব করেছি। রচনার অসমতা তার একটা কারণ। তা ছাড়াও অনেক জায়গায় বাক্যগঠন কৃত্রিম এবং শব্দপ্রয়োগ বিসদৃশ. এমনকি কখনো কখনো বক্তব্যবিরোধী মনে হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করি: "শুধু কবিতাই নয়, চিত্রকলাও তাঁর বাণে বিদ্ধ হয়েছে ;...রদাঁ, তাঁর নিঃসঙ্গ ও অবজ্ঞাত যৌবনে, যে-দুই কবিকে ভেদ ক'রে ধীরে ধীরে আপন পথটি দেখতে পান, তাঁরা দান্তে ও বোদলেয়ার।" (৩ পৃঃ)। "ক্লাসিক ও রোমান্টিক ধারণা দুটি পরস্পরের জন্যে তৃষিত..." (৭ পৃঃ)। "বরেল, তাঁর মহিমা অস্তমিত, পাড়াগাঁয়ে দীনবেশে ও অর্ধাশনে থেকে এই উপন্যাসটি লিখে উঠেছিলেন।" (২৩০ পৃঃ)। "১৮৪৫-এর আর একটি ঘটনা উল্লেখ্য: আসলিনোর সঙ্গে আমাদের কবির বন্ধুতার সূত্রপাত।" (২৪২ পৃঃ)। "তাঁর মনোরম সুনিয়ন্ত্রিত কণ্ঠে অনেকক্ষণ কথা বললেন—" (২৭৩ পৃঃ)। সবচেয়ে বিমূঢ় বোধ করেছি নিম্নলিখিত দুটি বাক্যের সামনে: "এক বৎসরের কিছু অধিককাল, বালক বোদলেয়ার তার মাতাকে একান্তভাব ভোগ করেন।" (২১৯ পৃঃ ; এবং "বাল্যে যে অল্পকাল তরুণী ও বিধবা মাতাকে একান্তরূপে ভোগ করেছিলেন, সেই 'বাল্যপ্রণয়ের সবুজ স্বর্গে'র স্মৃতি তাঁকে আমৃত্যু হানা দিয়েছে।" (২৩৬ পৃঃ)। ভালো কথা, বুঝলাম না বুদ্ধদেববাবু 'লক্ষ্য' এবং 'লক্ষ্য', এই দুই শব্দকেই 'লক্ষ' লেখেন কেন ; এবং তাই যদি লেখেন তাহলে 'বন্ধ্য' এবং 'বন্ধ', এই দুই শব্দকে দুই রকম না লিখে 'বন্ধ' লেখেন না কেন।

এই গ্রন্থে নামের যে সব উচ্চারণ দেওয়া হয়েছে তাতে যথেষ্ট ভুল আছে। অবশ্য সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ নামের উচ্চারণ ফরাসীতে অনেক ক্ষেত্রেই গোলমেলে। নিয়মও খাটে না কয়েকটি সুপরিচিত নামের উচ্চারণ উল্লেখ করছি:

'জর্জ সাঁ' নয়, জর্জ সাঁদ্ ; 'জেরার্দ দ্য নেরভাল' নয়, জেরার দ্য নেরভাল ; 'মাদাম দ্য স্তায়েল' নয়, মাদাম দ্য স্তাল, 'দেনিস দিদেরো' নয়, দনি দিদরো ; 'ভিয়েনি' নয়, ভিয়ের ; 'ওয়াতো' নয়, ভাতো ; 'দেগাস' নয়, দ্যগা ; 'ভ্যান গ' নয়, ভান গগ্ বা ভাঁ গগ (ফরাসী ধাঁচে), 'বেলিও' নয়, বের্লিওজ্ ; 'রীমস' নয়, র‍্যাঁস ; 'কমেদি ফ্রাঁসেস' নয়, কমেদি ফ্রাঁসেজ ; 'পোল ভালেরি'

নয়, পল ভালেরি ('পোল' বললে শোনায় মেয়ের নাম Paule)। 'বের্গস' অবশ্য অনেক ফরাসীই বলেন, কিন্তু নামটার আসল উচ্চারণ বের্গ্‌সন্‌। 'ম্যসে' বা 'ভিনৃঈ'র আগে সাধারণত 'গু' বসানো হয় না যদি না পুরো নাম লেখা বা বলা হয়।

কবিতা সাজানো সম্পর্কে অনুবাদক লিখেছেন, কবির মূল পরিকল্পনা যে সব সম্পাদক অনাহত রেখেছেন, তিনি তাঁদের অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ফরাসী ভাষায় প্রামাণ্য সংস্করণগুলোতে যে ভাবে এখন সাজানো হয়, এ বিন্যাস তো সে রকম নয়। এ নিয়ে তর্ক ওঠানো যায়, কিন্তু তা অপ্রয়োজনীয় মনে করি। বিন্যাসের স্থাপত্য সম্পর্কে বোদলের-এর চিন্তা আপাতত আমাদের কাছে গৌণ। মোটামুটি একটা পরম্পরা থাকলেই হল। অতএব এ অনুবাদে কবিতার যে-ক্রম পাওয়া গেল তাতেই আমাদের খুশী থাকা উচিত।*

১৯৬২

* বোদ্‌লেয়ার। তাঁর কবিতা। বুদ্ধদেব বসু। নাভানা।

কবি স্যাঁ-ঝন পের্স

স্যাঁ-ঝন পের্স নোবেল পুরস্কার না পেলে আশ্চর্যের কিছু ছিল না, বরং তাঁর পাওয়াটাই যেন একটু অস্বাভাবিক। কারণ ফ্রান্সের বড় কবিরা এ-পুরস্কার পাবেন না, এটা একরকম ধ'রেই নেওয়া গিয়েছিল। অকালমৃত্যুর জন্যে আপলিনের ও পেগি যদি বাদ প'ড়ে গিয়ে থাকেন, অন্যেরা কিন্তু অনেকদিন বেঁচে থেকেও পাননি। ক্লোদেল, ভালেরি, স্যুপেরভিয়েল, র‍্যভেরদি, এল্যুয়ার, কেউ না। সুতরাং পের্স কেন? অবশ্য সাহিত্যের জন্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার একজন ফরাসী কবিকেই দেওয়া হয়েছিল ১৯০১ সালে। দুঃখের বিষয়, তাঁর কবিতা আর কেউ বিশেষ পড়ে না, এমনকি, সাহিত্যের ইতিহাসেও স্যুলি প্রুদম নামটা এক কোণে প'ড়ে থাকে। হায় প্রচার, হায় পুরস্কার!

যাই হোক, এই সময় স্যাঁ-ঝন পের্সকে পুরস্কার দিয়ে নোবেল কমিটি ভালো কাজই করেছে। তাতে কবির গৌরব না বাড়ুক, আমাদের কিছু উপকার হতে পারে। তাঁর কাব্যের প্রতি এখন সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে। সেটা কাম্য। সাহিত্যে যখন কেরানী-কবিতার প্রাচুর্ভাব হয়, তখন ঐরকম সৃষ্টির দিকে তাকানো স্বাস্থ্যপ্রদ। পের্স-এর ফুসফুসে প্রচুর বাতাস, চোখের দেখা অবাধ এবং তাঁর পদক্ষেপ বিস্তীর্ণ পৃথিবীর পথে।

কবির আসল নাম আলেক্সি স্যাঁ-লেঝে লেঝে বা সংক্ষেপে আলেক্সি লেঝে। বরাবর পররাষ্ট্র বিভাগে বড় কাজ করেছেন। নিজের ঐ নামেই প্রথমে কবিতা প্রকাশ করেছেন, পরে নাম বদলে করেছেন স্যাঁ-ঝন পের্স। নাম বদল করেছেন বটে, কিন্তু কবিতার ভাবভঙ্গি বদলাননি।

স্যাঁ-ঝন পের্স বরাবরই কবিতা লিখেছেন গদ্যে। বাইবেলে ব্যবহৃত গদ্য স্তবকের মতো, ফরাসীতে যাকে বলে **verset**। তবে ছন্দের সঞ্চার তাতে মাঝে মাঝে এনেছেন এবং সাধারণ গদ্যের বাক্যবিন্যাস প্রায়ই ভেঙে দিয়েছেন। তাঁর এই গদ্যভাষায় শব্দের প্রবেশ অবারিত। প্রচলিত ও অপ্রচলিত, সহজ

ও কঠিন, বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামরিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সব রকম শব্দ ও অভিধাই তিনি কাজে লাগিয়েছেন। **Eloges, Anabase, Exil, Vents, Amers** এবং শেষ প্রকাশিত (যতদূর আমি জানি) **Chronique**—তাঁর সব কাব্যেই এই রচনা-রীতি।*

তাঁর এই গদ্যকাব্য রচনায় পথপ্রদর্শক নিঃসন্দেহে র‍্যাঁবো, ক্লোদেল এবং **Les Nourritures Terrestres**-এর ঝিদ্। মনে হয়, এ পদ্ধতিই পের্স-এর বক্তব্যের উপযুক্ত বাহন। জীবনকে বিশালভাবে ধরতে গেলে হিসেব করা পুরোনো ছন্দখিলে যেন আর কুলোয় না। জীবনকে এক **ope'ra fabuleux**-র মতো দেখা থেকে জন্মেছিল র‍্যাঁবোর হীরকপ্রভ গদ্য; দৃশ্য অদৃশ্য সবকিছুতে ঈশ্বরসত্তার অনুভবে ক্লোদেল সৃষ্টি করেন তাঁর কবিতার গভীর ধ্বনিময় গদ্য; এবং "মাটির উপর খালি পা রাখার" প্রয়োজনবোধে ঝিদ্ তাঁর ঐ একক কাব্য-গ্রন্থের গদ্য, যা মাটির মতোই উষ্ণ নিবিড়।

কাব্যের শরীর ও প্রাণ উভয় দিক থেকেই এ প্রয়াস মালার্মের বিপরীত। মালার্মে কবিতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক রুদ্ধতার পথে। শব্দ দিয়ে তিনি গড়তে চেয়েছিলেন এক স্বতন্ত্র স্বরাট জগৎ যেখান থেকে আমাদের এই জগৎ নির্বাসিত, যেখানে আমাদের প্রত্যক্ষ পদার্থের কোনো ব্যঞ্জনা নেই, যে ব্যঞ্জনা আছে তা তার বিলোপের। শেষ পর্যন্ত সেই অমানবিক জগতের। সৃষ্টিকর্তা নিজেরই সৃষ্টির মধ্যে বন্দী হয়ে গেলেন। বিংশ শতাব্দীতে যে-কবিরা বস্তুর পৃথিবীর দিকে চোখ ঘোরালেন, যাত্রা শুরু করলেন মালার্মের উল্টো পথে, স্যাঁ-ঝন পের্স তাঁদের অন্যতম প্রধান।

পের্স-এর সৃষ্টি আশ্চর্যরকম অখণ্ড। বলা যায়, তিনি শুধু একটি মহাকাব্যই লিখেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থ তারই এক-একটা পরস্পরসংযুক্ত ভাগ। এক গ্রন্থের বিভিন্ন অংশও যেন সেইভাবে গ্রথিত। সমস্তটা এক সিম্ফনির মতো। অনেক বিচিত্র ও বিভিন্ন ধ্বনি মিলিয়ে এক সমগ্র বিশিষ্ট স্বরমণ্ডল। বিষয় যেমন ঘুরে ফিরে বারে বারে আসে, তেমন আসে শব্দ, বাক্য ও বাক্যাংশ। একই গ্রন্থের মধ্যে এবং বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে। এ রচনাকে ব্যবচ্ছেদ ক'রে দেখানো

---

* নামগুলির মোটামুটি উচ্চারণ যথাক্রমে এলঝ্, আনাবাজ্, এক্‌জিল, ভাঁ, আমেরে, ক্রনিক্।

এবং লেবেল লাগানো সম্ভব নয়। সে-ধরনের সুবোধ্যতাও তার নেই। সমগ্রভাবে তার ক্রিয়াটাই তার সার্থকতা। পের্স-এর মহত্ত্ব এই যে তাঁর কাব্য কবিতা-প্রেমিক পাঠককে অভিভূত করে, তাঁর কাব্যের আন্দোলনে সে আন্দোলিত হয়। এ ছাড়া, কাব্যের অন্য সার্থকতাই বা কী আছে?

কিন্তু এ-মহাকাব্যের মূল বিষয় কী? এই বিশাল সঙ্গীতের থীম? এক কথায় উত্তর দেওয়া যায়: বস্তু ও মানুষ। সমস্ত বস্তু ও সমস্ত মানুষ। বিশেষ সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম ক'রে কবি তাঁদের অবলোকন করেন। তাঁর এই অবলোকন প্রাণসন্ধানী। পের্স-এর কাব্য বস্তুপুঞ্জের বিদ্যমানতা, বিস্তার, বেগ, রূপান্তর এবং তারই সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে মানুষের ভাগ্য, ইতিহাস, জীবনযাত্রা, আকাঙ্ক্ষার এক বিরাট ইঙ্গিতময় আলেখ্য। সসাগরা পৃথিবী ও নিরবধি কাল যেন তাতে বিধৃত এবং জঙ্গমতা তার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। গতির এমন স্পন্দন বর্তমান আর কোনো কাব্যে আছে কিনা সন্দেহ। প্রকৃতির শক্তি ও ব্যাপকতার রূপ যত কিছুতে, তার স্থান তাঁর কল্পনায় বিশেষভাবে: সমুদ্র, বৃষ্টি, হাওয়া, মরুপ্রান্তর, তুষারপাত। এরা যেন উজ্জীবনেরও ধারক! সবচেয়ে বেশি দেখা দেয় সমুদ্র—সমস্ত প্রাণের প্রসবিত্রী আদি জননী সিন্ধু। কবির আজন্ম পরিচয়ও তার সঙ্গে। সমুদ্রঘেরা ক্যারিবিয়ান দ্বীপে তিনি জন্মেছিলেন।

চারদিকের বস্তুর নামোচ্চারণ এবং আবাহন। বস্তু শব্দটিকেই তিনি বার বার লিখেছেন। প্রথম কাব্য থেকে শেষ কাব্য পর্যন্ত। যেমন, বাল্যস্মৃতির চিত্রণে Eloges-এ:

প্রত্যেক বস্তুকে আহ্বান করে আমি আবৃত্তি করতাম তা মহৎ…

এবং

আহা, স্তুতিময় বস্তুরা।

Anabase-এ:

শুনবার ও দেখবার অনেক বস্তু পৃথিবীতে,
আমাদের মাঝখানে জীবন্ত সব বস্তু।

Vents এ:

তারা সব অন্বেষী বিপুল হাওয়া এই
পৃথিবীর সমস্ত পথের উপর,
সমস্ত নশ্বর বস্তুর উপর, ধরাছোঁয়ার মতো

সমস্ত বস্তুর উপর, বস্তুর সমগ্র পৃথিবীর
মাঝখানে।

Chronique-এ :

বস্তুর সাগর আমাদের বেষ্টন করে।

বস্তুর অস্তিত্ব সর্বকালব্যাপী, নিছক তার উল্লেখ যান্ত্রিক অস্তিত্বের স্বীকৃতি মাত্র, যদি না তা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বস্তুর পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের নতুন সংযোগই তাঁর অন্বেষা। সঞ্জীবনী সংযোগ আজও হয়নি, আজও মানুষের নির্বাসিত জীবন। বিশ্বের জীবনে আমাদের জাগতে হবে, তার সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন করতে হবে, তবেই আমরা অদ্ভুত অবস্থা থেকে উদ্ধার পাব—মনে হয় এই তার কাব্যের মৌল ব্যঞ্জনা। তিনি বলেন :

সমস্তই আবার ধরতে হবে, সমস্তই আবার বলতে হবে।

বস্তুর পরিবেশে মানুষের ভূমিকাই পের্স-কাব্যের কেন্দ্র। তাঁর নিজের ভাষায়

মানুষই হল প্রশ্ন, তার সাযুজ্যই হল প্রশ্ন।

বস্তুর আর মানুষের নিগূঢ় পরিচয়। যা অন্য কোনো কিছুতেই উদ্‌ঘাটিত হয় না, সেই পরিচয় উদ্‌ঘাটনের প্রয়াসই কবিতার সৃজনশীল ধর্ম। সুতরাং দুয়ের মধ্যে নতুন মিলনের সন্ধানে পের্স তাঁর কবিসত্তাকেই নিয়োজিত রাখেন। বলেন :

মিলনাঙ্গুরীর জন্যে তোমার সোনা খুঁজে নাও, কবি।

মানুষের প্রতিভূ ও প্রবক্তার ভূমিকা কবির। তার উদ্ধারের সন্ধানে কবি সদাজাগ্রত :

এবং কবি তোমাদের সঙ্গে আছে। তার ভাবনা তোমাদের মাঝে রয়েছে বৃক্ষের মতো। সে যেন ঠিক থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত. সে যেন মানুষের সুযোগের উপর নজর ঠিক রাখে।

এবং

পৃথিবীতে কেউ কি কথা বলবে না? মানুষের জন্যে সাক্ষ্য…
কবি তার কথা শোনাক, সে তার পরিচালনা করুক।

বিশ্বের সমগ্র অস্তিত্ব ও রূপান্তর—সব অর্থে—পের্স-এর কবিদৃষ্টির অন্তর্গত। তাঁর কাব্যে প্রাচীন আধুনিক, বৃহৎ ক্ষুদ্র, সামাজিক প্রাকৃতিক সব

বিষয়েরই উল্লেখ। কিন্তু ঝোঁক পড়ে মানুষের উপর। সেটাই কেন্দ্র। মানুষ, তার আত্মা হৃদয়। সুতরাং ভবিষ্যতের ভাবনা অনিবার্যভাবে আসে। অতীত ও বর্তমানের বিপুল উৎসার যেমন তাঁর কণ্ঠে তেমনি তাতে ভবিষ্যতেরও এক প্রবল ধ্বনি। যা কিছু হয়েছে এবং হচ্ছে তা আর কিছু হয়ে ওঠার অভিমুখে। তাঁর কাব্যের মুখ ভবিষ্যতের দিকে ঘোরানো। ধ্বংস ও দুর্বলতার চেতনার মধ্যে এক উজ্জীবনের লক্ষ্য তাঁর সামনে, যেখানে পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের আত্মার আত্মীয়তা স্থাপিত হবে। তাই বলেন:

> হে ভবিষ্যতের যত উপকূল তোমরা যারা জানো কোথায় আমাদের পদশব্দ বাজবে, তোমরা ইতিমধ্যে নিরাবরণ পাথর আর নতুন পবিত্র জলপাত্রের উদ্ভিদকে সুরভিত করছো।

এবং

> তোমরা যারা এক সন্ধ্যায় এই পৃষ্ঠাগুলির মোড়ে ঝড়ের বিকীর্ণ অবশেষের উপর আমাদের কথা শুনতে পাবে, ঈগলাক্ষ বিশ্বস্ত তোমরা, তোমরা জানবে যে তোমাদের সঙ্গে
> আমরা এক সন্ধ্যায় মানবিকদের পথ ধরেছিলাম।

আর জীবনের প্রান্তে এসে শেষ কবিতায় শেষ ছত্রে লেখেন:

> মানুষের হৃদয়ের পরিমাপ নাও।

পের্স-এর কবিতায় এত বিষয়ের উল্লেখ, এত বিচিত্র শব্দ আর রূপকল্প। কিন্তু সবই এক অপূর্ব কণ্ঠস্বরপ্রবাহে ধ্বনিময় ও ভাবময়। বলা যায়, মহৎ বাগ্মীতা। কুশল বাগ্মীতাও বটে, কিন্তু সেই কুশলতা যা বড় কবির স্বভাবগত। যে-সব অংশ দিয়ে তাঁর কবিতার সমগ্রতা গড়া, তাদের প্রত্যেকেরই একটা অনুরণন আছে, শব্দগুলোই যেন অনেক সময় মানুষী আবেগে সজীব। তাঁর চিত্রকল্পও যেন অলঙ্কার নয়, এক উপস্থিতি। আসলে প্রাণময়তা তাঁর কবিতার চারিত্র্য। কয়েকটি পৃষ্ঠার গদ্যের স্তবকে এবং শব্দের আবৃত্তিতে তিনি "স্মৃতি, পরিকল্পনা, আবেগ, দৃশ্য, রূপকথা ও ঘটনার" এক অনুভবনীয় জগৎকে উদ্ভাসিত করেন। সাধারণ যুক্তিগ্রাহ্য অর্থের জন্যে সেখানে মাথাব্যথা থাকে না।

তাঁর কবিতা ভেঙে ভেঙে বিশ্লেষণ করা যায় না, তার সমগ্র আবহাওয়াটাই অনুভব করবার। পের্স-এর অন্যতম ইংরিজী অনুবাদক কবি এলিয়টও নাকি

total impression-এর কথা বলেছেন। তবু কোনো কোনো ফরাসী রসজ্ঞ বিভিন্ন কব্যগ্রন্থের বিষয় ও বক্তব্যের কিছু বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের অনুসরণ ক'রে মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া যাক। পেস'কে প্রথম যাঁরা পড়বেন হয়তো তাঁদের সুবিধে হতে পারে।

Eloges-এ কবির শৈশবস্মৃতি। সমুদ্রঘেরা দ্বীপে কৃষ্ণাঙ্গ পরিচারক ও পরিচারিকা পরিবৃত স্বচ্ছল জীবনধারা। সমুদ্র, আকাশ আর পাকা ফলের রঙে ভরা এক আশ্চর্য জগৎকে শিশু ধরতে চায়। পার্থিব স্বর্গের এক অসাধারণ বর্ণনা এই কাব্যে। উজ্জ্বল, বিচিত্রবর্ণ। মনুষ্যসন্তানের উপহার-পাওয়া নানা সম্পদের স্মৃতিমুখর রূপ।

Anabase-এ মানবযাত্রীর চলা। রুক্ষ কঠিন মাটি, পৃথিবীর পরিমাপে আকাশের ঘেরাটোপ। হারানো স্বর্গের সন্ধান, অতৃপ্য আত্মার উন্মাদনা, বিপুল অস্থির মাধুর্য। নিরালা, বিশাল প্রকৃতির রূপ আঁকেন কবি, যেখানে অদম্য মানুষ দূর সমুদ্রের ডাক শোনে, অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে যাওয়ার তৃষ্ণা নিয়ে এগোয়। আবিষ্কারের গান যেন সর্বত্র ছড়ানো। সমস্ত বস্তুর প্রতি অপূর্ব অন্তরঙ্গতার প্রকাশ।

Exil এর বিপরীত দিক। বিচরণের স্বাধীনতা মানুষ হারিয়েছে, এক শত্রু তার পাখামেলা আনন্দকে অপহরণ করেছে। আত্মার মুক্ত ক্ষেত্রকে ফিরে পাবার জন্যে কবির আহ্বান তাঁদের কাছে যাঁরা কোনো আবেগকে বা কোনো অন্বেষণকে রাজ-নির্বাসনে রূপান্তরিত করেছেন, আহ্বান বিপুল বৃষ্টি আর তুষারের কাছে যারা সব ধুয়ে দেবে, ঢেকে দেবে।

Vents যেন মানব-ইতিহাসের এক মহাবিবরণী। হাওয়ারা মানুষকে শস্যের মতো ঝাড়াই বাছাই করে, দুরন্ত বেগে সভ্যতা ও মানব-মনের মরা পাতা উড়িয়ে নিয়ে যায়, গতিপথে জীবন্ত ও মৃত স্থাপত্যকে ছুঁয়ে যায়, গ্রন্থাগারের ধুলো ওড়ায়। বণিক, ধর্মসংস্থাপক, সংস্কারক, পরশমণি আর পরমাণু সন্ধানী এবং নারী ও সন্ন্যাসের আকর্ষণের সামনে যাদের যেতে হয় তাদের সবার উল্লেখ করেন কবি। যে তাদের সবাইকে হাওয়ার মুখে ধরে সেই কর্মকে আহ্বান করেন। এ-হাওয়ার সামনাসামনি না হলে, তার সঙ্গে যোগসাজস না করলে উদ্ধার নেই। জীর্ণ ও ঘুণধরা, ঝুটা ও পচনধরা সব কিছুকে যে নিঃশ্বাস গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দেয় তার সঙ্গে হাত মেলালেই তবে উদ্ধার। **Vents** যেন বর্তমান সভ্যতার পতনের এক মহাকাব্য।

Amers-এ সমুদ্রের অভ্যুত্থান। উপকূলে, জাহাজঘাটায়, বাঁধের ধারে ভূমির সঙ্গে জলরাশির সাক্ষাৎ। সেখানে পরস্পরের সম্ভাষণ, গভীর কথোপকথন। পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষের উজ্জীবন তার কাছে :

সমুদ্রের নিজের প্রশ্ন নয়, মানুষের হৃদয়ের উপর তার রাজত্বের প্রশ্ন।

মানুষ তার নিজের ইতিহাসের ভারে ভেঙে পড়বার উপক্রম করেছে, কিন্তু তার সামনে জন্মের অতলস্পর্শ উৎস সমুদ্র :

> বিরাট সবুজ সমুদ্র মানুষের পূর্বাচলে প্রত্যূষের মতো,
> আমাদের সীমান্তে নিশিজাগরণ আর উৎসব, মানুষের স্বরে গুঞ্জন আর উৎসব…

এ-কাব্য মানুষের এক নবজীবনের গান।

পরিশেষে তাঁর আধুনিকতম রচনা Chronique। জীবনের অস্তাচলে পৌঁছে জীবনব্যাপী অন্বেষার বিবরণী। পথ এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু দৃষ্টি স্থির হয়েছে মানুষের হৃদয়ের উপর, আত্মার শৌর্যের উপর :

> আজ সন্ধ্যায় আমরা যে-সমুদ্র দেখছি তা একই সমুদ্র নয়।
> সে-স্থান যত উঁচুই হোক আর এক সমুদ্র উত্থিত হয় দূরে, মানুষের ললাটের স্তরে সে আমাদের অনুসরণ করে।…
> বৎসর দিয়ে যে-সময় মাপা হয় তা আমাদের সময় নয়। ক্ষুদ্রতম বা নিকৃষ্টতমর সঙ্গে আমাদের কারবার নেই। আমাদের জন্যে দিব্য বিক্ষোভের শেষ আলোড়ন।

এ শেষ আলোড়নে চরম দায়িত্ব মানুষের হৃদয়ের পরিমাপ নেবার।

এ-ও এক উজ্জীবনেরই সঙ্গীত।

ভাবলে খুব অবাক হতে হয় এ-কাব্য কী ক'রে লিখলেন আলেক্সি লেঝে, যাঁর জীবন কেটেছে পররাষ্ট্র বিভাগে বড় চাকরী ক'রে। রাষ্ট্রদূত ক্লোদেলকে তবু বোঝা যায়। তাঁর কবিতার বিষয় বিবেচনা ক'রে এবং তাঁর দৈনিক উপাসনাদির কথা মনে রেখে একটা সামঞ্জস্য করা যায়। কিন্তু পৃথিবী ও মানুষের এই উত্তপ্ত প্রত্যক্ষ বিশাল সংস্পর্শ আলেক্সি লেঝে কেমন ক'রে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত রাখলেন? প্রথম আমলে তাঁর কবিতা লেখা দেখে প্রধানমন্ত্রী পোয়াঁকারে এক চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন, "প্রিয় লেঝে, তুমি কাব্যদেবীর

সঙ্গে খুনসুটি করছো।" খুনসুটি যে ছিল না তা দেখাই গেল, অবশ্য রাজনীতিকের পক্ষে তাই মনে করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই আশ্চর্য কবিসত্তাকে তিনি কোথায় রেখেছিলেন? Amers-এ কবি যেন স্মিত হাস্যে স্বপ্নময় চোখে এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন:

> হাসি আর সৌজন্যের আড়ালে আমার গোপন উক্তিকে কে ধরতে পারত? আমার রক্তের মানুষদের মাঝখানে বিদেশীর ভাষা ব'লে চলতাম—হয়তো কোনো পার্কের কোণে কিম্বা কোনো দূতাবাসের সোনালি ফটকের ধারে। হয়তো আমার মুখ পাশ-ফেরানো থাকত এবং আমার কথার ফাঁকে দৃষ্টি থাকত দূরে, যেখানে বন্দরকর্তার দপ্তরের উপর পাখি গান গাইত।

সন্দেহ নেই তাঁর সরকারী কর্মদক্ষতাটা ছিল নিছক বুদ্ধিগত, আনুষ্ঠানিক। তাঁর অন্তরঙ্গ জীবন তার বাইরে মেলা ছিল।

তাঁর বিদ্যাও যেন আনুষ্ঠানিক ছিল। অন্তত তিনি নিজে তা পরে অবান্তর মনে করেছেন। নানা বিষয়ে তাঁর অনেক পড়াশুনো, তাঁর কাব্যে তার প্রচুর ছাপ। কিন্তু তাঁর কাব্যের যে-প্রত্যক্ষ জীবনরূপ তার মধ্যে শুকনো বিদ্যাচর্চার স্থান নেই। এ-উপলব্ধি তিনি নিজেই কবিতায় প্রকাশ করেছেন:

> কোন্ সবুজ বসন্তের উৎসবে এই আঙুল ধুতে হবে, বইপত্রের তাকের ধুলোয় কলঙ্কিত এই আঙুল?
>
> অসংখ্য বিষণ্ন গ্রন্থ তাদের খড়ির মতো বিবর্ণ প্রান্ত নিয়ে সাজানো।

তিনি তাদের দলে "যাদের জন্মগত স্বভাব পরিচয়কে জ্ঞানের চেয়ে উঁচুতে রাখা।" সুতরাং বই সম্বন্ধে আগ্রহ শেষ পর্যন্ত থাকে না। যুদ্ধের সময় থেকে অনেকদিন তিনি ওয়াশিংটনের কংগ্রেস লাইব্রেরীতে ফরাসী সাহিত্য বিষয়ে পরামর্শদাতার কাজ করেন। তিনি কী ধরনের পড়াশুনো করেন তার হদিস পাবার জন্যে মার্কিন সাহিত্য-সমালোচকরা পরে লাইব্রেরীতে খাতাপত্র তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজেন। কিন্তু বৃথা। পের্স নিজের পড়ার জন্যে পাঁচ বছরের মধ্যে একখানা বইও নেননি। বিদ্যাচর্চা তিনি অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছেন। মিলনাঙ্গুরীর জন্যে সোনার সন্ধানী কবি তিনি, বইয়ের বিদ্যায় তাঁর কী আজ আর?

১৯৬০

ফ্রান্সের সাহিত্যিক দৃশ্য : দুই যুগ : উপন্যাস

এক.

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সে দুটি প্রবল সাহিত্য-আন্দোলন হয়েছিল। একটি ঠিক যুদ্ধ শেষে, অন্যটি পূর্বের উত্তরাধিকারীরূপে কয়েক বছর পরে। দুটি আন্দোলনই করেছিলেন কবিরা। দাদাইজ্‌ম্‌ এবং স্যুররেয়ালিজম-এর তাৎপর্য এবং প্রভাব অবশ্য ব্যাপকতর ছিল, কিন্তু কবিরাই তাদের সৃষ্টি করেছিলেন এবং জীবন্ত রেখেছিলেন। স্যুররেয়ালিজম্‌-এর প্রধান নেতা আঁদ্রে ব্রার্ত এখনো উদ্যমশীল, কিন্তু তাঁর সে-আন্দোলন ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। দাদাইজম্‌-এর স্রষ্টা ত্রিস্তাঁ ৎসারা (জন্মে রুমানীয়, সাহিত্যকর্মে ফরাসী) পরলোক গমন করেছেন গত জানুয়ারী মাসে (১৯৬৪)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে-সাহিত্য-আন্দোলন হয়েছে তার প্রবর্তক কিন্তু কবিরা ন'ন, গদ্য লেখকেরা। চল্লিশ সাল থেকে ষাট সাল পর্যন্ত সাহিত্যের স্রোত নতুন মোড় নিয়েছে উপন্যাসে এবং নাটকে। বেগবান আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু কবিদের প্রতি অবিচার করা হবে যদি ধ'রে নেওয়া হয় তাঁরা অন্যদের তুলনায় নির্জীব হয়ে পড়েছেন। লেখার উদ্যম দেখলে সে-ধারণা হয় না। হয়তো একসঙ্গে একটা কিছু করার নতুন কারণ আপাতত তাঁদের নেই। তাঁরা বহু আগে যা করেছেন, তার প্রভাব অন্যান্য ক্ষেত্রে সক্রিয়, এমনকি সাম্প্রতিক নাটকে ও উপন্যাসে। দাদাইজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে নব্য উপন্যাস আন্দোলনের আত্মীয়তা আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য নয়। স্যুররেয়ালিজ্‌ম্‌-এর প্রেরণা তো অল্পবিস্তর বহু ক্ষেত্রেই আছে। অন্য মুলুকের বীটনিক জাতীয় আন্দোলন ফ্রান্সের কবিরা এখন করতে যাবেন কেন? তাঁদের কাছে ও এক মান্ধাতার আমলের ব্যাপার, ও সব নাচানাচি তাঁরা এত আগে চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়েছেন যে, এখন তার খবরে তাঁদের হাসি পাবার কথা। অবশ্য বালখিল্য উৎসাহ দেখে কিঞ্চিৎ স্নেহ বোধ করাও স্বাভাবিক। যাই হোক,

গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে এ পর্যন্ত নতুন কোনো ব্যাপক আন্দোলন তাঁরা করেননি। একটি আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে: লেত্রিজ্‌ম্, যার নেতা হলেন কবি ইজিদর ইজু (ইনিও রুমানীয়)। শব্দ নয়, অক্ষরই হল কবিতা রচনার মৌল উপাদান, এই তত্ত্বকে জাহির ক'রে এঁরা কিছু বইপত্র লিখেছেন বটে, তবে তার কোনো ফল বিশেষ হচ্ছে ব'লে মনে হয় না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ফ্রান্সে কবি এবং কবিতার এক নতুন ভূমিকা কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনাহীন। ১৯৪০ থেকে '৪৪ পর্যন্ত নাৎসী দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রামে কবিতাই ছিল প্রেরণার বাণী। বিখ্যাত, অল্পখ্যাত ও অখ্যাত কবিদের রচনা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাদের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। শত্রুর বিরুদ্ধে কবিতা হয়ে উঠেছে এক অমোঘ অস্ত্র। যদিও তা সাহিত্যিক আন্দোলন নয়, তবু সাহিত্যের ইতিহাসে এ আন্দোলন অভূতপূর্ব। আশ্চর্যভাবে প্রমাণিত হল যে, বৃহৎ সঙ্কট যখন আসে, তখন কবিতাই হয় জাতির প্রাণের ভাষা। অন্য কোনো মাধ্যম তার সমকক্ষ নয়। ফ্রান্সে এই বিশাল কাব্য-উৎসারে বহু কবির নাম ঝলকিত হয়েছে: তাদের মধ্যে দুটি নাম সবচেয়ে উজ্জ্বল: এলুয়ার এবং আরাগঁ। প্রতিরোধ এবং মুক্তির বাণী তাঁরা যেভাবে সঞ্চারিত করেছেন এমন আর কেউ নয়। ফ্রান্সের বিগত যুদ্ধকাল কবিতার এক মহা উজ্জীবনকাল।

আবেগের মুহূর্তে কবিতা মানুষের যত অব্যবহিত ভাষা হতে পারে, অন্য কিছু তা পারে না। গদ্য অর্থাৎ উপন্যাস গল্প নাটক ইত্যাদিকে খানিকটা অপেক্ষা করতে হয়। অবস্থা একটু থিতোলে, একটা পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া গেলে তবে কাঠামো ঠিক হয়, বক্তব্যকে রূপ দেওয়া যায়। যুদ্ধকালীন ফ্রান্সেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পরাজয়, পরাধীনতা, প্রতিরোধ এবং মুক্তি বিষয়ে সার্থক রচনা কবিতার পরে হয়েছে অন্য ক্ষেত্রে। সাধারণভাবে, মুক্তি লাভের পরে। কিন্তু গদ্য লেখকেরা যুদ্ধের সময় যে নীরব থেকেছেন তা নয়। প্রতিরোধের সময় বহু গদ্যকাহিনীও প্রচারিত হয়েছে, সেগুলিও প্রেরণা সঞ্চার করেছে। যেমন, গোপনে প্রকাশিত ভেরকর-এর **Le Silence de la Mer**। যুদ্ধ, পরাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রাম বহু ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখকের রচনার বিষয় হয়েছে। কয়েকজনের নাম ও রচনা উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা: ঝাঁ-পল সার্ত্র্-এর বিখ্যাত উপন্যাস **Les Chemins de la Liberte'**, বিশেষভাবে তার তৃতীয় খণ্ড **La Mort dans l'Ame** (১৯৪৯ সালে

প্রকাশিত) ; সিমন দ্য বোভোয়ার-এর **Le Sang des autres** (১৯৪৫) ; রঝে ভাইয়াঁ-র **Drole de Jeu** (১৯৪৫) ; দাভিদ রুসে-র **Les Iours de Notre Mort** (১৯৪৭) ; ঝাঁ-লুই কুারতিস-এর **Les Forets de la Nuit** (১৯৪৭)। শেষোক্ত তিনজনের বই প্রতিরোধ, বন্দীদশা এবং নাৎসী দখলের শক্তিশালী আলেখ্য। নিম্নলিখিতরাও উল্লেখযোগ্য : এলসা ত্রিয়োলে, পিয়ের কুর্তাদ্, পল তীয়ার, ফ্রাঁসিস আঁত্রিয়ের। প্রতিরোধ-সংগ্রাম সম্বন্ধে মরিস ক্লাভেল-এর নাটক **Les Incendiaires**-ও (১৯৪৫) একটি উল্লেখ্য রচনা। আলবের কাম্যু-র **La Peste**-কে রূপক হিসেবে ধরলে তা-ও এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

ফ্রান্সের লেখকেরা যুদ্ধ ও প্রতিরোধে শুধু লিখেই ক্ষান্ত হননি, শারীরিক-ভাবে তাতে অংশ গ্রহণ করেছেন। আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্প নিয়ে সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। অনেক লেখক প্রাণ হারিয়েছেন। কেউ সংগ্রামে, কেউ বন্দীশালায়। নাৎসী ঘাতকের গুলিতেও মরেছেন কয়েকজন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, অন্যেরা চিন্তা ও সৃষ্টির জগতে নিশ্চিত প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। বন্দীশালায় নির্যাতনের ফলে প্রাণ হারান বিখ্যাত কবি ও চিত্রকর মাক্স ঝাকব, অন্যতম প্রধান কবি রবের দেস্নস্, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক ব্যাঁঝামাঁ্যা ক্রেমিয়ো, চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক ব্যাঁঝামাঁ্যা ফঁদান্ ; নাৎসী ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রাণ দেন সাংবাদিক গাব্রিয়েল পেরি, ঔপন্যাসিক ঝাক হুকুর, দার্শনিক ঝর্ঝ্ পলিৎসের, সাহিত্যতাত্ত্বিক ভালাঁত্যাঁ ফেল্দ্মান ; প্রতিরোধের লড়াইতে নিহত হন কবি-ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক ঝাঁ প্রেভো, এবং রণক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক পল নিজাঁ। বিখ্যাত বর্ষীয়ান কবি সাঁ-পল-রু'ও নাৎসীদের হাতে নিহত হন। এ ছাড়াও আরও লেখক প্রাণ হারান। আর বন্দীশালার অভিজ্ঞতা হয় অনেকেরই।

অন্য পক্ষেও কিছু লেখক ছিলেন। রাজনীতির নিরিখে তাঁরা দক্ষিণপন্থী। শার্ল মোরাস-এর 'আকসিয় ফ্রাঁসেজ' আন্দোলনের সঙ্গে তাঁরা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কেউ বা নতুন দক্ষিণপন্থী আন্দোলন সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা যুদ্ধের সময় ভিড়েছিলেন নাৎসী শিবিরে। অন্য কেউ কেউ স্বভাবগত রক্ষণশীলতার প্ররোচনায় নাৎসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। এই আচরণের জন্যে হিটলারের পরাজয়ের পর তাঁদের মূল্য দিতে হয়। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক দ্রিয়ো লা রশেল তাঁদের অন্যতম। তিনি

অবশ্য শাস্তি এড়ান আত্মহত্যা ক'রে। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সী কবি ও ঔপন্যাসিক রবের ব্রাজিয়াক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। আর বৃদ্ধ মোরাস-এর হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। যাঁদের আত্মরক্ষার বোধ বেশ তীক্ষ্ণ ছিল তাঁরা আগে থেকেই সাবধান হয়ে হাত গুটিয়ে নেন। যেমন, নাট্যকার ও সমালোচক তিয়েরি মোনিয়ে। এই সব লোক এখন অবশ্য আবার জাতে উঠেছেন। যাঁরা ধর্মতন্ত্র, অসম সমাজ-ব্যবস্থা, এমনকি সামন্ত-ব্যবস্থা এবং উপনিবেশ (অবশ্যই) প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে অকুলতা দেখিয়েছেন তাঁরা পুরস্কৃত হচ্ছেন। মোনিয়ে সম্প্রতি ফরাসী আকাদেমীর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তরুণদের মধ্যে যাঁরা ফরাসী সাম্রাজ্য-গৌরব এবং প্রাচীন সমাজ-গৌরবের জয়গান করেছেন, তাঁরা আকাদেমীর পারিতোষিক পাচ্ছেন।

দুই

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকে প্রথম দশ বছরের সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক আন্দোলনের ভিত্তি নিরীশ্বর অস্তিত্ববাদ। যদিও এ এক দর্শনতত্ত্ব তবু তাকে অবলম্বন ক'রে সাহিত্যে যে-ফসল ফলেছে তা বিস্ময়কর। ঝাঁ-পল সার্ত্র্-এর প্রবল ব্যক্তিত্ব এই চিন্তা ও সৃষ্টির কেন্দ্রে। আপাতদৃষ্টিতে এই মতবাদ মনে হয় যেন নৈরাশ্যের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। অস্তিত্ববাদী রচনার তাৎপর্যে এবং সার্ত্র্-এর ব্যক্তিগত সংগ্রামী আচরণে তা প্রতীয়মান। সার্ত্র্-এর একদা ঘনিষ্ঠ সহযোগী কামুর কণ্ঠেও তা প্রকাশিত। মানুষের অস্তিত্বই একমাত্র গ্রাহ্য বস্তু এবং এ-অস্তিত্বের ভিতরে ও চারিদিকে কোনো যৌক্তিকতা নেই, মানবিক প্রকৃতি ব'লে সাধারণ সারসত্তা কিছু নেই, এবং ঈশ্বর আছেন এমন কোনো সত্যের প্রতিফলন মনুষ্য-জগতের ঘটনাবলীতে নেই— শুধু এই সিদ্ধান্তেই সার্ত্রীয় মতবাদ আবদ্ধ নয়। তার এক মূল কথা হল এই যে, মানব-প্রকৃতির কোনো নির্দিষ্ট বা পূর্ব-নির্ধারিত সংজ্ঞা নেই ব'লেই প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা সীমাহীন, প্রত্যেক মানুষ বাঁচার মধ্যে দিয়েই তার সারসত্তা সৃষ্টি করে, প্রত্যেক মানুষ নিজেকে যা করে তা-ই হতে পারে। নিজের প্রতি তার দায়িত্ব হল এই স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করা এবং অন্যদের উপলব্ধি করানো। অতএব অস্তিত্ববাদী মতে সাহিত্যসৃষ্টিও হবে দায়িত্বশীল,

'শিল্পের জন্যে শিল্প' নয়, সাহিত্যকে হতে হবে engagé, মনুষ্য-ব্যাপারে সচেতনভাবে লিপ্ত।

এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চিন্তাবিদ্ ও শিল্পী সিমন দ্য বোভোয়ার-এর উক্তি এ-সম্পর্কে স্পষ্ট। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন; "নিষ্ক্রিয় হতে অস্বীকার ক'রেই মানুষ মানুষ, যে-আকুতি তাকে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে নিক্ষিপ্ত করে এবং সব জিনিষকে আয়ত্ত করার ও নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী রূপায়িত করার লক্ষ্যে তাকে ঠেলে দেয় সেই আকুতির দ্বারাই মানুষ মানুষ। তার কাছে, থাকা মানেই হল অস্তিত্বকে পুনর্গঠন করা, বাঁচা মানেই হল বাঁচার ইচ্ছা করা।" তাঁর উপন্যাসের এক নায়কের মুখেও শোনা যায়: "আমি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি; কিন্তু তাকে আমি আমার উপস্থিতি দ্বারা প্রতি মুহূর্তে পুনঃসৃষ্টি করি।"

কামু্য যদিও নিজেকে অস্তিত্ববাদী ব'লে অভিহিত করতে অস্বীকার করেন, তবু তাঁর বক্তব্য কার্যত এর কাছাকাছি। মানুষের অস্তিত্ব অর্থহীন, ঈশ্বর নেই, যৌক্তিকতা নেই, ন্যায় নেই; এ-অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় আত্মহত্যা, কিন্তু আত্মহত্যার মানে অর্থহীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া, তার কাছে আত্মসমর্পণ করা, সুতরাং একমাত্র পথ হল বিদ্রোহ; হত্যায় আকীর্ণ জগতে ঈশ্বরবিশ্বাস-মুক্ত মানুষ যদি অন্য মানুষের সম্বন্ধে সচেতন হয় তাহলেই সে তার অস্তিত্বের অর্থহীনতাকে অতিক্রম করতে পারে।

এ-দর্শনতত্ত্বের বিশদ উপলব্ধি যতই কঠিন হোক, সাহিত্যকে তা গভীর-ভাবে উজ্জীবিত করেছে। মানুষ যে ধরাবাঁধা ছকের জিনিষ নয়, তার সত্তার সার নিরন্তর সৃষ্টি ও আবিষ্কারের বিষয়, এই বোধ এবং অন্যের সম্বন্ধে চেতনা—এ দু'য়ের শিল্প-সম্ভাবনা স্পষ্টতই অন্তহীন। সুতরাং সার্থক শিল্পকর্ম এই মহলের প্রতিভাবান লেখকরা আমাদের উপহার দিয়েছেন। সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য তা এই যে, এঁদের রচিত সাহিত্য দর্শনতত্ত্বের প্রমাণপঞ্জী নয়, নিছক সাহিত্য হিসেবেই তার যোগ্যতা অবিসংবাদী।

এই আন্দোলনের শীর্ষে ঝাঁ-পল সার্ত্র্। সর্ব বিষয়েই তিনি অসাধারণ—মনীষায়, শিল্প-ক্ষমতায় এবং সততায়, সাহস যার এক অন্তর্নিহিত উপাদান। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিল্পীর সাহস যে কী প্রচণ্ড হতে পারে, তার অন্যতম দৃষ্টান্ত তিনি। লেখকদের চাটুকারিতা এবং আত্মসমর্পণের যুগে এ-কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বছর চারেক আগে ফ্রান্সে একটি দল

ধরা পড়ে, তাঁরা ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত স্বাধীনতাকামী আলজিরিয়ানদের গোপনে সাহায্য দিচ্ছিলেন; এই গুপ্ত দলের সঙ্গে সার্ত্র-এর সংযোগ ছিল। ফ্রান্সের সামরিক আদালতে ধৃতদের বিচার আরম্ভ হয় এবং প্রসঙ্গক্রমে সার্ত্র-এর নামও ওঠে। তিনি সে-সময় দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্রমণরত ছিলেন। তাঁর কথা উঠেছে জেনে তিনি সেখান থেকে সামরিক ট্রাইবিউনালের সভাপতির কাছে এক পত্র লেখেন। পত্রটি পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন কী দারুণ সেই পত্র। ভাষায় ও ভাবে শাণিত তলোয়ারের মতো। ফরাসী সরকারের গর্হিত সাম্রাজ্যবাদী আচরণ এবং যে-সব তথাকথিত বিপ্লবী কার্যকালে আলজিরিয়ানদের সাহায্য দিতে পরাঙ্মুখ তাদের আচরণ তিনি কঠিন আঘাতে জর্জরিত করেন এবং নিজের অটুট সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন; পরিশেষে সামরিক বিচারকর্তাকে এ-কথা মনে রাখতে বলেন যে বিচারকর্তার ভূমিকায় তিনি এক প্রহসনের অভিনয় করছেন, যেরকম প্রহসন ইতিহাসে অনেকবার অভিনীত হয়েছে। এর পর সার্ত্রকে রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত করার দাবীতে কাগজেপত্রে খুব সোরগোল ওঠে। কিছুদিন বাদে উগ্র উপনিবেশবাদী ফরাসীরা যখন ফ্রান্সের মধ্যে সন্ত্রাসমূলক আক্রমণ আরম্ভ করে, তখন একাধিকবার বোমার দ্বারা সার্ত্র-এর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়।

সার্ত্র-এর উপন্যাস, গল্প ও নাটক পড়ার সময় তাঁর দার্শনিক মনীষার কথা আমাদের মনে আসে না। এইখানেই শিল্পীরূপে তাঁর কৃতিত্ব। **La Nause'e** তাঁর প্রথম উপন্যাস। ১৯৩৮ সালে এটি প্রকাশিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এর নায়ক রকাঁত্যাঁ-র বিবর্ণ জীবন, তার চারপাশের সব কিছুর অনুজ্জ্বলতা, নিজের কাছে নিজের বাহুল্যবোধ, তার বিবমিষা, অবশেষে নিজের সত্তার স্বাধীনতাবোধে বাঁচার যুক্তি অনুভব—এর বিবরণে অসামান্য শিল্পীর স্বাক্ষর স্পষ্ট। তাঁর ছোট গল্পগুলিতেও সেই দক্ষতা। **Les Chemins de la Liberte'** স্পেন-যুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বৃহৎ পটভূমিতে বিভিন্ন ব্যবহারের অনেকগুলি একত্রিত মানুষের কাহিনী, যাদের ব্যক্তিগত ঘটনা ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, অ.পাতনির্দিষ্টতা সত্ত্বেও যারা নতুন নতুন ভাবে উদ্ভাসিত, যাদের চরিত্র প্রতি মুহূর্তে অন্য সম্ভাবনার সম্মুখে।

সার্ত্র-এর রচনার আঙ্গিক বিস্তারিত আলোচনার বিষয়। এখানে শুধু

তাঁর ভাষার উল্লেখ করি। ফরাসী গদ্যের একটা মোড় সার্ত্র্। ভাষার উপর তাঁর আধিপত্য বিস্ময়কর। স্থূল সূক্ষ্ম যে-কোনো শ্রেণীর শব্দকে তিনি অতি স্বাভাবিকভাবে এক প্রবহমান গদ্যে গ্রথিত করেন। একসঙ্গে বহুতা ও কঠিনতার এমন সমন্বয় আর কারো গদ্যে দেখা যায় না। অলঙ্কার তিনি বর্জন করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর রচনার স্থানে স্থানে কাব্য বিচ্ছুরিত হয়।

সিমন দ্য বোভোয়ার সার্ত্র্-এর কর্মসঙ্গিনী এবং জীবনসঙ্গিনী। সম্প্রতি তাঁর আত্মজীবনীর যে-তৃতীয় খণ্ড (**La Force des choses**) প্রকাশিত হয়েছে তাতে সার্ত্র্-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিনি বিশদভাবে অকপটে বিবৃত করেছেন। লেখক হিসেবে বোভোয়ার-এর অসাধারণত্বও স্পষ্ট। মেয়েদের মধ্যে তাঁর মতো মনীষা বিরল। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ-গ্রন্থ তার সাক্ষ্য। মেয়ে হিসেবে সকরুণ সুবিবেচনা তাঁর প্রাপ্য নয়, নিজের ক্ষমতায় পুরুষের পাশে তাঁর আসন। তাঁর উপন্যাসও 'মেয়েলী' উপন্যাস নয়। উৎকর্ষের সে-জাতিবিচার তাঁর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা চলে না। তাঁর প্রথম উপন্যাস **L' Invite'e** (১৯৪৩) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি অর্জন করে। মূলত এ সেই ত্রয়ীর কাহিনী : এখানে দুই নারী, এক পুরুষ। কিন্তু এ-কাহিনীকে বোভোয়ার মানব-অস্তিত্বের গভীরতর তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছেন। অন্যের জন্যে দায়িত্ব নিতে যতই অগ্রসর হই না কেন, অন্যতার বাধা পাঁচিল হয়ে দাঁড়ায় : অবশেষে মানুষ ধ্বংসের দ্বারা অন্যতাকে ধ্বংস করতে চায়—এই ধরনের এক ট্র্যাজিক আবহাওয়ায় গ্রন্থের পরিণতি। **Le Sang des autres** এর নায়ক এক শিল্পপতির সন্তান যে তার শ্রেণীকে বর্জন করেছে, সে জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রামের যোদ্ধা। লক্ষ্য ও পদ্ধতির উভসংকটের মধ্যে তার কাহিনীর বিবর্তন। তাঁর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য উপন্যাস **Les Mandarins**-তে তিনি যুদ্ধ-পরবর্তী বছরগুলিতে বামপন্থী মহলের এক ধরনের বিবরণী দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, লেখিকার প্রচ্ছন্ন বেদনাময় আত্মস্বীকৃতি যার সঙ্গে জড়িত।

কাম্যুর সাহিত্য-প্রতিভা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছিল নোবেল প্রাইজের দ্বারা। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, অনেক অযোগ্য লেখকও নোবেল প্রাইজ পেয়ে থাকেন। ১৯৪২ সালে **L'Etranger** উপন্যাস তাঁর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক বৈর পৃথিবীতে মানুষ যেন ভিন্‌দেশী, নিজের কাছেও সে ভিন্‌দেশী, মানুষের পরিপার্শ্ব অর্থহীন—নায়ক ম্যোরসো-র

জীবন ও আচরণের বিবরণ এই বক্তব্যকে আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত করেছে। এর পর La Peste কাম্যুকে আরও খ্যাতিমান করে। আলজিরিয়ার ওরান শহরে প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সেই অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ এ-উপন্যাসের বিষয়। নাৎসী দখল ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এ এক রূপক কাহিনী, সাধারণভাবে এই ব্যাখ্যাই স্বীকৃত। তবে মানুষের উপর চাপানো যে-কোনো ব্যাপক অন্যায়কে প্লেগ ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। নিঃসন্দেহে এর বক্তব্যের ব্যাপ্তি সাধারণ মানবিক অবস্থার প্রশ্নে। ধর্ম ও নীতির প্রসঙ্গও লেখক এতে উত্থাপন করেছেন। পরিশেষে ড: রিয়োর জবানীতে মানুষের প্রতি ভালোবাসার সুরটাই সবচেয়ে বেশি ধ্বনিত। পরবর্তী উপন্যাস La Chute-এ কাম্যু মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্বের প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন। অন্যের অপরাধ শুধু অন্যের নয়, তার জন্যে প্রত্যেক মানুষই নিজের কাছে দায়ী, এই রকম উপলব্ধি এর বিষয়।

আমাদের দুর্ভাগ্য, মোটর দুর্ঘটনায় কাম্যুর জীবন অকালে শেষ হয়। তাঁর কাছ থেকে মহৎ সৃষ্টির আরও প্রত্যাশা ছিল সকলের। কাম্যুর রচনা-শৈলী সার্ত্র্ থেকে খুবই পৃথক। তাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্য তার দৃঢ়নিবদ্ধতায়, তার সারল্যে। একটুও উচ্চকণ্ঠ না হয়ে কাম্যু তাঁর রচনায় প্রবল আবেগ সঞ্চার করতে পারতেন।

তিন

১৯৫০ সাল থেকে দশ বছরে ফ্রান্সের সাহিত্যিক আবহাওয়া অনেক বদলে গিয়েছে, বিশেষত উপন্যাস ও নাটকের ক্ষেত্রে। আগের দশকে প্রধান লেখকদের ভাবনা ছিল মানব-নীতিগত। পূর্বগামীদের সঙ্গে তার একটা পারম্পর্য ছিল। প্রাকযুদ্ধ কালে যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, তাঁদের অনুধ্যান ও বিশ্লেষণের বিষয় ছিল মানবিক অবস্থা এবং তাঁদের মনের প্রকাশে এক নৈতিক উদ্বেগ জড়িত ছিল। ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক, আঁদ্রে মালরো, ঝ্যুলিয়াঁ গ্রীন, ঝাঁ ঝিওনো, স্যাঁৎ-একজ্যুপেরি, বের্নানস প্রভৃতি লেখকদের এই সাধারণ ধর্ম প্রথমেই লক্ষ্যে আসে। যুদ্ধের পর যে-অস্তিত্ববাদী বা অস্তিত্ববাদ-সংশ্লিষ্ট লেখকরা সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকৃষ্ট করেন, তাঁদের সৃষ্টিতে ও প্রেরণায় সেই ঐতিহ্যই বজায় ছিল। কিন্তু তারপর তা থেকে বিদায়। নৈতিক বা আধ্যাত্মিক

প্রশ্ন অতঃপর লেখকদের ভাবনা নয়, অন্তত প্রধান ভাবনা নয়। পঞ্চম দশকে এবং তার পরে ফরাসী সাহিত্যের পটভূমি থেকে মানুষের অবস্থার বিশ্লেষণ এবং তার তাৎপর্যের অনুধাবন বহুলাংশে অপসৃত। এর কারণ কী? সাধারণ ঋতুবদল? না নৈরাশ্য? অবশ্য নতুন পথের সন্ধান সাহিত্যিকের পক্ষে স্বাভাবিক। বিভিন্ন প্রবণতা সব যুগেই থাকে, তবে মহৎ শিল্পীদের মাধ্যমে একটা মূল সুর প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন ফ্রান্সে আগের আগের যুগে হয়েছিল। কোনো মূল সুর এখন যেন আর নেই, থাকলেও তা এখনো আমরা শুনতে পাচ্ছি না। যুদ্ধের পর সমাজের বদল সম্বন্ধে যে-ব্যাপক আশা জেগেছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, মানুষের অবস্থার সংস্কারসাধন এক অসম্ভব প্রত্যাশা ব'লে অনেকের কাছে প্রতীয়মান, একাকীত্ববোধ আরও বেড়েছে। মনে হয়, সাহিত্যের আবহাওয়ার পরিবর্তনে এই আশাভঙ্গের অনেকখানি অংশ আছে।

এই সাধারণ পটভূমিতে আজ বহু লেখকের ভিড়। নিত্য নতুন নাম শোনা যায়। নিত্য নতুন চাঞ্চল্য, যার অনেকখানি প্রচারকার্য। হঠাৎ নবাব বা দু'দিনের নবাবের সংখ্যাও কম নয়, বিশেষত বিভিন্ন সাহিত্য-পুরস্কারের কৃপায়। এঁদের মধ্যে কে যে বড় বা কত বড়, সময়ের এত কম ব্যবধানে তা বলা খুবই কঠিন। এক-একজনের মতে মহাপুরুষ-তালিকা এক-এক রকম। বছর কয়েক আগে একটি পত্রিকা গণভোট নিয়ে দশজন শ্রেষ্ঠ আধুনিক ঔপন্যাসিকের নাম ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু অন্য পত্রিকায় তাঁদের অধিকাংশকে নস্যাৎ ক'রে দেওয়া হয়। এক সমালোচকও তাঁর বিচার অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ দশজনের নাম লিখেছিলেন, যে-মতের সঙ্গে পূর্বোক্ত দুই মতের মিল নেই। অতএব শ্রেষ্ঠতা বিচার করা এখন নিরর্থক এবং নামের ভিড়ে প্রবেশ করাও সমীচীন নয়। তার চেয়ে বিভিন্ন ধারাগুলো নির্দেশের চেষ্টা করা এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু লেখকের উল্লেখ করাই ভালো।

সাধারণভাবে যাকে বাস্তব বলা হয় অর্থাৎ ঘটনার বাস্তবতার কাহিনী নিয়ে একদল লেখক আজ ব্যাপৃত। এঁদের উপন্যাস এক ধাঁচের নয়, নানা ধাঁচের। এর মধ্যে যেমন অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী আছে, তেমনি আছে মানুষের সাধারণ ব্যক্তিগত সম্পর্কের সংঘাতের কাহিনী কিম্বা কোনো বড় ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে কিছু চরিত্রের চিত্রণ। কোনো ব্যাপক বা গভীর প্রশ্নের উপস্থাপন এই বাস্তববাদে নেই। এর্ভে বাজঁ্যা, মিশেল দ্য সাঁ্যা-পিয়ের, রজে পেরফিৎ, সের্ঝ গ্রুসার, ঝাঁ উগ্র এই শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন। এঁরা

সবাই জনপ্রিয় লেখক। রবে ভাইয়াঁ, রমঁ্যা গারি, মিশেল সেস্ত্রঁ-র রচনা এই ধরনের বটে, কিন্তু তাঁদের এই শ্রেণীতে ঠিক সন্নিবিষ্ট করা চলে না, কারণ তাঁদের রচিত কাহিনীর পেছনে একটা সমাজ-ভাবনা উপস্থিত থাকে। নৈতিক দিক থেকে মানব-সমাজকে অবলোকন করার প্রয়াস তাঁরা বিসর্জন দেননি। কিন্তু বাজঁ্যা যখন তাঁর 'বাস্তব' উপন্যাসে মায়ের সঙ্গে ছেলের বিরোধ বিবৃত করেন তখন তা এক নিছক ঘটনা মাত্র, তার কোনো ব্যাপক তাৎপর্য থাকে না। এঁদের সকলেরই রচনাশৈলী মোটামুটি প্রথাগত, কোনো নতুনত্বের প্রয়াসী এঁরা নন।

আর এক ধারায় আছেন তাঁরা যাঁরা নারী-পুরুষের মন ও শরীর দেয়া-নেয়ার খেলা নিয়ে ভীষণ একাগ্র। এঁদের অন্যতম রবে নিমিয়ে। দুঃখের বিষয়, এখন তিনি আর নেই, দু বছর আগে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়েছে। আর একজন হলেন বিশ্বজোড়া খ্যাতিময়ী ফ্রাঁসোয়াজ্ সাগাঁ। বলাই বাহুল্য, এঁদের বইয়ের বিক্রি খুব। সাগাঁর লেখার ক্ষমতা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সে-ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাঁর এতটা প্রতিষ্ঠা যে কেন হবে তা বোঝা দুঃসাধ্য। একটা কারণ অবশ্য এই যে, তিনি নাবালিকা বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন, যাতে পরিণত বুদ্ধির প্রকাশ ছিল। কিন্তু সে বুদ্ধির আর বিকাশ হয়নি। মোটের উপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি নারী-পুরুষের আকর্ষণ-বিকর্ষণ তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণার ক্ষীণজীবী কাহিনী লিখে চলেছেন। তাঁর তুলনায় ফ্রাঁসোয়াজ মালে-ঝরিস এমন কিছু কম ক্ষমতাশালিনী মনে হয় না। বরং আরও সাহসিকা। মেয়েদের মধ্যে প্রেম নিয়ে তিনি শিল্পরুচিসম্মত উপন্যাস লিখেছেন। সাহসে ক্রিশ্চিয়ান রশ্‌ফর এঁদেরও অতিক্রম করেছেন। পুরুষ ও নারীর জান্তব আকর্ষণ ও সম্পর্কের চিত্রণে তাঁর প্রথম উপন্যাস পুরুষদেরও চমকে দিয়েছিল। লেখিকা হিসেবে মার্গরিৎ দ্যুরাস্-এর উৎকর্ষও এখানে উল্লেখযোগ্য। বাস্তব ঘটনায় নাটকীয়তা সঞ্চারের ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে।

ইদানীং ফরাসী সাহিত্যের আসরে লেখিকাদের ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এতদিন তাঁরা পুরুষদের অনুপূরক ছিলেন। তাঁদের যেন একটা বিশেষ মানসিক ক্ষেত্র ছিল, যা নেহাৎই নারীসুলভ। বিশেষ এক লাবণ্য এবং আতুর আবেগ ছিল তাঁদের রচনার বৈশিষ্ট্য (তবে এ-কথা এখানে স্মরণ করা দরকার যে, পৃথিবীর সর্বপ্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস লেখেন ফ্রান্সেরই এক নারী সপ্তদশ শতকে : মাদাম দ্য লা ফাইয়েৎ)।

ঐ সব বৈশিষ্ট্য ফরাসী লেখিকারা বর্জন করছেন। নারী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে তাঁরা বিবিধ সম্পর্কের কথা বিবৃত করছেন। কোলেৎও তাঁর রচনায় যে 'নারীত্ব' বজায় রেখেছিলেন, তাঁরা তা রাখছেন না। এটা এক দিক থেকে পুরুষদের পক্ষে এক মর্মান্তিক আঘাত। স্নেহসুলভ পিঠ-চাপড়ানো বন্ধ হতে চলেছে এবং নারী সম্বন্ধে মুগ্ধতার আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে আত্মপ্রসন্ন হওয়া যাচ্ছে না। একজন সমালোচকের মতে এরই প্রতিক্রিয়ায় ফরাসী লেখকদের রচনায় আজ অস্বাভাবিক যৌনরুচির এত বেশি প্রকাশ (ঝাঁ ঝ্যনে, পেরফিৎ ইত্যাদি)।

বাস্তব নিয়ে ভাবিত নন এমন লেখকও আছেন। তাঁরা স্বপ্নপ্রয়াণে আগ্রহী। এক কল্পনার জগৎ সৃষ্টি ক'রে সেখানে তাঁরা আশ্রয় নেন। এ-ধারা অবশ্য ছিলই। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে আল্যাঁ ফুর্নিয়ে-র **Grand Meaulnes** স্মরণীয়। আঁরি তমা, আঁদ্রে দোতেল, ঝুঁ্যলিয়্যাঁ গ্রাক, আঁরি বস্কো— এঁদের এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। বস্কো অবশ্য অতি প্রাচীন-বয়স্ক লেখক, কিন্তু তিনি সাধারণের কাছে পরিচিত হন গত মহাযুদ্ধের পর। **Le Mas The'otime** তাঁকে প্রচুর খ্যাতি দেয়। দোতেলও বৃদ্ধ, কিন্তু অবিশ্রান্ত লিখে চলেছেন। এই পৃথিবীর মানুষকে নিয়ে অন্য এক পৃথিবীর দ্যোতনা, আপাত অবিশ্বাস্য ঘটনাকে সত্যের মতো ক'রে বলা, দৈনন্দিনকে রহস্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা—এই হল এসব রচনার প্রয়াস। কিন্তু প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। যেমন, তমার রচনায় মনুষ্যচরিত্রের বিশেষত নারীচরিত্রের রহস্যময় উদ্‌ঘাটন এবং দোতেলের সাধারণ মানুষ ও ঘটনার রূপকথা রচনা—এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর।

আর একদল আবির্ভূত হয়েছেন যারা পূর্বোক্তদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বর্তমানের বাস্তববাদী অথবা স্বপ্নবিলাসী অথবা 'সামাজিক' লেখকদের সঙ্গে তাঁদের কোনো মিল নেই। এঁদের পাঠক তেমন বেশি কিছু আছে কিনা সন্দেহ, থাকার কথা নয়, কিন্তু সাহিত্যজগতে এঁরা ভীষণ আলোড়ন জাগিয়েছেন। এঁরা সৃষ্টি করেছেন **Nouveau Roman** অর্থাৎ নব্য উপন্যাস আন্দোলন। এঁরা এক বিশেষ ধরনের বাস্তববাদী। ঘটনা এবং তার সাধারণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এঁদের কাছে আসল বাস্তব নয়। তাকে তাঁরা মূল্য দেন না। তাঁদের লক্ষ্য তাকে অতিক্রম ক'রে বস্তু ও ঘটনার অন্তর থেকে গভীর সত্যকে উন্মোচিত করা। স্বভাবতই এ চেষ্টায় কাহিনীর গুরুত্ব নেই।

নব্য উপন্যাস আন্দোলনে দু'জনের প্রেরণা সর্বাধিক : আলঁ্যা রব-গ্রীয়ে এবং মিশেল ব্যুতর। নাতালি সারোৎ-ও এই পথের একজন বিশিষ্ট লেখিকা। অবশ্যই তাঁদের রচনা একরকম নয়। রব-গ্রীয়ে মানুষের চেয়ে বস্তুর উপর বেশি জোর দেন। মানুষের একটা কাহিনী ক্ষীণভাবে থাকে, কিন্তু তা বস্তুর উপস্থিতি ও বর্ণনায় হারিয়ে যায় এবং ব্যক্তির মন এই বস্তু-ব্যাখ্যানের পটভূমিতে অস্পষ্ট বা বিবিধ অর্থগ্রাহ্য হয়ে দাঁড়ায়, যা লেখকের ইচ্ছাকৃত। ব্যুতর ব্যক্তির মনকে হারিয়ে যেতে দেন না, বরং তার বিশ্লেষণ করেন বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক'রে, কখনো বা একই বস্তু ও ঘটনাকে বিভিন্ন ব্যক্তির চেতনায় প্রতিফলিত ক'রে বিবৃত করেন। ফলে স্পষ্ট কোনো মনের চেহারা আসে না, নানা তাৎপর্যে বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে তা একাকার হয়ে যায়। নাতালি সারোৎ-এর চেষ্টা কী রকম তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস তার এক দৃষ্টান্ত। তা কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার আলেখ্য নয়। আসল বিষয় হল জনৈক লেখকের লেখা একটি উপন্যাস। লেখকের নামটিও নেহাৎ আনুষঙ্গিক। শেষ পর্যন্ত ঐ উপন্যাস অর্থাৎ একটি শিল্পকর্ম যেন এক চরিত্র হয়ে ওঠে। মানুষদের মনোভাব তাকে নতুন নতুন রূপে মণ্ডিত করে, আবার ঐ শিল্পকর্মও মানুষদের মনোভাবকে বদলায়। পরিশেষে সব মিলে যেন এক অনির্দিষ্ট সমষ্টিগত চেতনার জন্ম হয়। নব্য উপন্যাসের লক্ষ্যটা মোটামুটি এই রকম : কোনো ঘটনা বা বস্তুকে সোজাসুজি উপস্থিত করলে তার যথার্থ রূপ ধরা পড়ে না ; যদি বিবিধ ঘটনা ও বিবিধ বস্তুকে মানসিক কোণ থেকে বিবৃত করা যায় তাহলেই জীবনের আসল রহস্যটা অনুভব করা সম্ভব। রহস্য হয়তো অনুভব করা যায়, কিন্তু তার জন্যে ধৈর্য ধ'রে শেষ পর্যন্ত পড়া দরকার। অতটা ধৈর্য ক'জনের আছে? এবং যাঁদের আছে, পড়তে পড়তে শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে তাঁদের অনেকের অনুভবশক্তি একেবারে অসাড় হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। তবে এ-কথা বলা উচিত, এই নব্য উপন্যাসের উদ্ভব ভুঁইফোড় নয়, অতীতের প্রেরণা এর পেছনে আছে। কাফ্‌কা ও জয়েস-এর নাম করা যায়। কাম্যু-র (বিশেষত **L'Etranger**-এর রচয়িতা রূপে) এবং সাত্র্‌-এর সঙ্গেও যোগসূত্র স্পষ্ট। এবং আরও বলা উচিত, সাধারণ পাঠককে সন্ত্রস্ত ক'রে তুললেও এ নব্যরীতি তরুণ লেখকদের খুব উৎসাহিত করেছে। বহু তরুণ এই পথের যাত্রী হয়েছেন।

১৯৬৪

সাগাঁ এবং অন্য কয়েকজন

এক·

ফ্রাঁসোয়াজ্ সাগাঁ ভাগ্যবতী। সাহিত্যে প্রেম ও জীবন সম্বন্ধে ক্রমাগত ক্লান্তি আর মোহভঙ্গ প্রকাশ ক'রেও বিয়েথা ক'রে ঘরসংসার পাততে পারলেন ব'লে নয়। ভাগ্যবতী এই কারণে যে, রাতারাতি তাঁর দুনিয়াজোড়া নামডাক হয়েছে এবং বইবিক্রি থেকে তাঁর লাখ লাখ টাকা আসছে। লিখতে না লিখতে তাঁর প্রথম বই ইংরিজী মারফত বাংলায় পর্যন্ত তর্জমা হয়ে গিয়েছে। এ-সৌভাগ্য খুব কম লেখকেরই হয়। রেম° রাদিগের হয়নি। ১৯২০-র সঙ্গে ১৯৫৪-র অনেক তফাত।

নাম ছড়াবার উপায় এখন বিস্তৃত। এমন প্রচারব্যবস্থা আগে ছিল না। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে প্যারিস শহরে দারুণ হুলুস্থুল পড়ে—কোন্ ঔপন্যাসিক-কে কোন্ পুরস্কার দেওয়া হবে? পুরস্কার কি একটা! প্রি গঁকুর, প্রি রনোদো, প্রি ফেমিনা, প্রি দে ক্রিতিক, প্রি মেদিসিস, প্রি আঁ্যাতেরালিয়ে, প্রি কাজেস্ এবং আরও কত। এ ছাড়া বুড়ী আকাদেমীরও কয়েকটা পুরস্কার আছে। তবে যেহেতু সে সনাতনধর্মের পালিকা সেহেতু বেছে বেছে সাধারণত প্রবীণ পরম পাকাদেরই সে পুরস্কৃত করে, তারুণ্য তার কাছে বিশেষ প্রশ্রয় পায় না। সুতরাং আকাদেমী এই চাঞ্চল্যের বাইরে। চমক আছে অন্য পুরস্কারগুলোয়। যারা উঠ্তি লেখকদের জয়মালা পরায়। টাকার অঙ্ক বেশি নয়, কিন্তু প্রচার-মূল্য প্রচুর। কোনো বই যদি একটা পুরস্কার পেয়ে যায়, তাহলে সে-সংবাদ এবং তার আনুষঙ্গিক 'তথ্যাদি' আজকাল পত্রপত্রিকা এবং বেতার বাহনে বিশ্বময় ছড়ানোর সুবিধে কত। ফলে অঢেল বিক্রি। পুরস্কার সম্বন্ধে সর্বসাধারণের দুর্বলতা সুবিদিত। যেমন বিশ্ববিদ্যার ছাপ থাকলে মনে হয় মস্টারমাইণ্ড, তেমন পুরস্কারের ছাপ থাকলে মাস্টারপীস। আর তা যদি না-ও মনে করে কেউ তবু অন্তত কৌতূহলবোধ করে। বই কেনে। সুতরাং অনুমান করা শক্ত নয় প্যারিসের এই বৎসরান্তিক অনুষ্ঠানে শুধু লেখকরা নয়,

প্রকাশকরাও জড়িত। প্রকাশ্য প্রতিযোগী অবশ্য প্রথমেরা, কিন্তু অন্তরালে দ্বিতীয়েরা। যে যে বই পুরস্কার পাবে তাদের প্রকাশকরা বাজার জাঁকাবেন।

প্রত্যেক পুরস্কারের জন্যে পুস্তক নির্বাচনের একটা কমিটি আছে। বছরের বই নিয়ে তার সদস্যদের বৈঠক বসে, আলোচনা হয়, বাক্‌বিতণ্ডা চলে, শেষকালে ভোট। তার বিবরণও কাগজে ফলাও ক'রে বের করা হয়। পড়লে মনে হবে যেন পার্লামেন্টের অধিবেশন বসেছিল এবং রাষ্ট্রকর্তা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। ভোট যেখানে আছে সেখানে ক্যানভাসিং আছে, দল ভাঙানো দল ভারী করার চেষ্টা আছে। তবু ব্যাপারটা একেবারে বাজে ব'লে উড়িয়ে দেওয়া বোধহয় যায় না। কারণ যাঁরা বই নির্বাচন করেন তাঁরা সকলেই সাহিত্যিক অথবা সাহিত্যরসিক। বই লেখা বা বই পড়া সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষজ্ঞতা আছে। কিছু না হোক, বছরকার বইয়ের ভিড় থেকে একটা ছাঁটাই-বাছাই তাঁরা ক'রে দেন, এমন কিছু লেখককে চিনিয়ে দেন যাদের উপর লক্ষ্য রাখা উচিত। অবশ্য প্রাইজ যাঁরা পান না তাঁরা যে লক্ষণীয় নন তা নয়। তবু।

১৯৫৩ সালে আঠারো বছর বয়সে ফ্রাঁসোয়াজ্‌ কোয়ারেজ ওরফে সাগাঁ প্রথম বই লেখেন: **Bonjour Tristesse** এবং পুরস্কার পান প্রি দে ক্রিতিক। এই অল্প বয়সে যে-ক্ষমতার পরিচয় তিনি দেন তা সাধারণ নয়, কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য হল এই যে, আধুনিক প্রচারযন্ত্রের সাহায্য তিনি পেয়ে যান। অল্পদিনে তাঁর খ্যাতি ও অর্থ দুই-ই প্রচুর জোটে এবং প্রথম সাফল্যের টানে পরবর্তী বইগুলোর বিক্রিও নিশ্চিত হয়ে যায়। রেমঁ রাদিগের সে সৌভাগ্য হয়নি, যদিও তাঁর প্রতিভা আরও বিস্ময়কর। রাদিগে তাঁর প্রথম উপন্যাস **Le Diable au Corps** লেখেন সতেরো বছর বয়সে ১৯২০ সালে। একটা পুরস্কারও পেয়েছিলেন: প্রি দ্যু নুভো মঁদ, তবে সে-পুরস্কার যেন জোর ক'রে পাওয়া, কারণ বিচারকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন তাঁর বন্ধু ও পরিচিত এবং তাঁরাই পুরস্কারটির পত্তন করেছিলেন। মাত্র দু'বছর সেটি টিঁকেছিল, কিন্তু পুরস্কার পেয়ে রাদিগের বৈষয়িক লাভ বিশেষ কিছু হয়নি। খ্যাতি ও টাকা কোনোটাই ঘরে আসেনি। আর একটা উপন্যাসও তিনি লেখেন কুড়ি বছর বয়সে: **Le Bal du Comte d'Orgel**। তার পর আর কিছু লেখার সুযোগ পাননি, কারণ কুড়ি বছর বয়সেই ১৯২৩ সালে

টাইফয়েডে তিনি মারা যান। দ্বিতীয় বইটা তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

দুই

সতেরো বছর বয়সে বালকত্ব ঘোচে না। তখন ক্ষমতা মানে ক্ষমতার সম্ভাবনা। তখনকার চেষ্টায় কাঁচা হাতের ছাপ অনেক থাকে। ক্রমে বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে ক্ষমতা পরিণতি পায়। অতএব ঐ বয়সের প্রথম চেষ্টাই যদি নিজস্ব পরিণত বোধ এবং তার উপযোগী প্রকাশ-শক্তির পরিচয় দেয় তাহলে আশ্চর্য লাগে। অকাল প্রতিভা অবশ্য অনেক সময় প্রবঞ্চনাও করে। লেখক ও পাঠক উভয়কেই। ক্ষমতা আর বিস্তার ও গভীরতার দিকে যায় না। দেখার চেয়ে দেখানোর নেশা লেখককে চেপে ধরে, যেটা মারাত্মক। তার চেয়ে বোধহয় ভালো অল্পে অল্পে গ'ড়ে ওঠা, নিশ্চিত বনিয়াদ তৈরি হওয়া। কিন্তু এও কোনো ফরমাসের ব্যাপার নয়। যার যেমন ক'রে হয়।

র‍্যাদিগে সতেরো বছর বয়সেই পরিণত মন নিয়ে তাঁর উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসের বালক-নায়কও পরিণত মানুষের ভূমিকা নিয়েছে। **Le Diable au Corps**-এর গল্পাংশ স্বল্প: বয়সে কিছু বড় এক বিবাহিতা তরুণীর সঙ্গে এক বালকের অবৈধ প্রেম, অবশেষে সন্তানজন্মের সময় প্রণয়িনীর মৃত্যু। মার্ত্-এর সঙ্গে নায়কের দেখা হয়েছিল তার বিয়ের ঠিক আগে: তার নববিবাহিত স্বামী চ'লে গেল ফৌজে, অতঃপর এই ঘনিষ্ঠতা। মহাযুদ্ধের অস্বাভাবিক পটভূমিতে এই সম্পর্কের স্থাপনা। বালক-গ্রন্থকার বালক-নায়কের মুখ দিয়েই কাহিনী বিবৃত করেছেন। প্রারম্ভেই সে বলে: "অনেক ভৎ'সনা হয়তো আমায় শুনতে হবে। কিন্তু আমি কী করতে পারি? যুদ্ধ-ঘোষণার কয়েক মাস আগে যদি আমার বারো বছর বয়স হয়ে থাকে তবে সে কি আমার দোষ? সেই অসাধারণ যুগটাতে যে-ধরনের বিপাক আমার উপর এসে পড়ে তার অভিজ্ঞতা এ-বয়সে কারো হয় না···যাঁরা আমার প্রতি বিরূপ হবেন তাঁরা যেন মনে ক'রে দেখেন বহু অতি-তরুণ বালকের পক্ষে যুদ্ধটা কী ছিল: চার বছরের এক লম্বা ছুটি।" এই লম্বা ছুটির অভিজ্ঞতায় বালকের জীবনে বড়মানুষের নাটক এ কাহিনীকে র‍্যাদিগে যেমন টানটান আবেগে ভরেছেন তেমন তার উপর আগাগোড়া বুদ্ধির অকম্পিত আলো ফেলেছেন।

এবং এ-কাজের উপযুক্ত বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন দৃঢ় সংযত ভাষা। তাঁর লেখায় কেউ কেউ আদিরসকেই প্রধান দেখেন, কিন্তু বস্তুত এতে শরীর-ব্যাপারের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে দুই প্রণয়াচ্ছন্ন প্রাণীর মানস-জীবন। বিশ্লেষণ এবং তার মাধ্যমে আবিষ্কার। তাই বিস্মিত হয়ে শুনি নায়কের এই উক্তি: "প্রথম চুম্বনের আস্বাদ আমাকে হতাশ করেছিল যেমন হতাশ করে প্রথম আস্বাদিত ফল। আমরা সবচেয়ে বড় যে-আনন্দ পাই তা নতুনত্ব থেকে আসে না, আসে অভ্যাস থেকে। কয়েক মিনিট পরে আমি যে শুধু মার্ত্-এর মুখে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম তাই নয়, তা বাদ দিয়ে আর চলবার উপায়ই রইল না আমার।" প্রণয়িনীর আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদের আঘাতের পর নায়ক যখন আবার মৃত্যুর কথা ভাবতে পারে তখন সে-ভাবনার এই বর্ণনা আমরা পাই: "মার্ত্! আমার ঈর্ষা তাকে কবরের মধ্যে পর্যন্ত অনুসরণ করল। আমি কামনা করতে লাগলাম মৃত্যুর পর কিছু যেন না থাকে। যাকে আমরা ভালোবাসি সে অনেকের সঙ্গে উৎসবে ব্যাপৃত রয়েছে যে-উৎসবে আমরা অনুপস্থিত, এটা সহ্য করা যায় না। তেমনি। আমার হৃদয়ের তখন সেই বয়স যখন ভবিষ্যতের কথা কেউ ভাবে না। আমি মার্ত্-রে জন্যে কামনা করলাম না নতুন পৃথিবী যেখানে একদিন আমি তার সঙ্গে মিলিত হব: আমি তার জন্যে কামনা করলাম বিলুপ্তি।"

নায়কের এই বিশ্লেষণমূলক আত্মবিবৃতির ধাঁচটা অবশ্যই ব্যাঁঝাম্যাঁ কঁস্তাঁর **Adolphe**-এর, কিন্তু দৃষ্টি সম্পূর্ণ রাদিগের। তাছাড়া এ লেখার একটা স্বাভাবিকতা লক্ষ্যণীয়। যদিও বালক-নায়ক কামনার উজ্জীবন থেকে কামনার ক্ষয় পর্যন্ত এক প্রাপ্তবয়স্ক অভিজ্ঞতার পূর্ণ পথ অতিক্রম করেছে, তবু সে শিশুত্বকে ছাড়িয়ে যায়নি। শিশু পুতুল পেলে খুশী হয়, কিন্তু পরে তাকে ভেঙে ফেলে দেখবার চেষ্টা করে ভেতরে কী আছে। এই পাওয়া, খেলা করা আর ভেঙে ফেলার কাহিনী এ-বইতে অকপটে বলা।

কিন্তু রাদিগের দ্বিতীয় উপন্যাসে প্রথমের স্বতস্ফূর্ততা নেই, তার পাশে এটা পোষাকী লাগে। এও প্রেমের কাহিনী: অর্ঝেল-এর কাউন্ট, কাউন্টেস এবং যুবক ফ্রাঁসোয়া, এই নিয়ে ত্রিভুজ। নিছক অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রণ এতে পাই। ফ্রান্সে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের গোড়াপত্তন করেছিলেন মাদাম দ্য লাফাইয়েৎ। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর সেই বিখ্যাত **La Princesse de Cleves**-এর প্রথম অংশের সঙ্গে এ বইয়ের মিল স্পষ্ট। ভঙ্গিতে স্ত্যাঁদাল-এর

প্রভাবও প্রত্যক্ষ। যদিও কক্‌তো তাঁর ভূমিকায় বলেছেন এটাই মাস্টারপীস তবু পড়লেই বোঝা যায় এর পেছনে সহজ প্রেরণা নেই। রাদিগের কাগজপত্রও প্রমাণ দেয় তিনি সঙ্কল্প ক'রে নিয়েছিলেন এটা হবে **roman d'amour chaste**—অপাপবিদ্ধ প্রেমের উপন্যাস। পেছনে একটা ফরমাসও ছিল। প্রথম বই প'ড়ে কবি মাক্স ঝাকব তাঁকে লিখেছিলেন: "তোমার উপন্যাস স্বচ্ছ দৃষ্টির এক আশ্চর্য সৃষ্টি—তবে আমার রুচির দিক থেকে আমি কামনা করি তোমার পরের উপন্যাস যেন কম নিষ্ঠুর এবং আরো নিষ্কলুষ হয়।" মাক্স ঝাকব তখন প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর সঙ্গেই রাদিগের প্রথম পরিচয়। সুতরাং তাঁর কথায় প্রভাবিত হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। বেঁচে থাকলে রাদিগে যে তাঁর সহজতা ও স্বকীয়তায় ফিরে আসতেন এবং আজ সাতান্ন বছর বয়সে এক নিজস্ব সাহিত্যকীতিকে সম্পূর্ণ ক'রে তুলতেন তা কল্পনা করা চলে। প্রথম গ্রন্থেই সে-ক্ষমতার আভাস আছে।

তিন

প্রসন্ন ভাগ্য নিয়ে আর এক তরুণ লেখকও জন্মাননি। আল্যাঁ-ফুর্নিয়ে। অবশ্য অতটা অকালপরিণতি তিনি কোনো দিক দিয়েই দেখাতে পারেননি। তিনি পঁচিশ বছর বয়সে লেখেন তাঁর **Le Grand Meaulnes**। আর কোনো পুরো বই লিখতে পারার আগেই তিনি রণক্ষেত্রে মারা যান ১৯১৪ সালে। আজকের দিনে হলে, ধ'রে নেওয়া যায়, তিনি একটা পুরস্কার পেতেনই এবং তাঁর অর্থ ও যশের অভাব থাকত না। এই একটা গ্রন্থই পরে তাকে বিপুল খ্যাতি দিয়েছে। মৃত্যুর পরে ১৯৩০ সালে **Nouvelle Revue Francaise** এ-গ্রন্থের সম্মানে একটা বিশেষ সংখ্যাই প্রকাশ করে।

আল্যাঁ-ফুর্নিয়ের লেখা সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর। এই দৈনন্দিন বাস্তব জগৎকে ছাড়িয়ে অন্য এক জগতের, তাঁর ভাষায় "এক নামহীন রাজ্যের" আকর্ষণ তাঁকে অস্থির করেছিল। হারানো শৈশব স্বর্গের সঙ্গে এক ক'রে তাকে তিনি খোঁজেন এবং মোন-এর অ্যাডভেঞ্চারে সেই সন্ধানের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। রহস্যময় দুর্গভবনে শিশুদের উৎসবের মধ্যে ইভন্ দ্য গালেকে দেখা, স্বপ্নের মতো সে-ঘটনা মিলিয়ে যাওয়া, পথের অন্বেষণ, আশাভঙ্গ, পরে ইভনকে পাওয়া, বিবাহ, ইভনের মৃত্যু—মোন-এর তরুণ জীবনের কাহিনীটা এই-

রকম। প্রথম অংশের বর্ণনায় ঘটনায় রূপকথার আস্বাদ, বাস্তব অবাস্তবে সহজ মিতালি। রচনার গুণে এ-অংশ মুগ্ধকর। পরবর্তী অংশ কিন্তু তেমন নয়। কিছু কিছু জায়গা ছেলেমানুষিও মনে হয়। তবে স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের ব্যাখ্যায় সবই মানিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

এ-লেখা অন্য ধারার, রাদিগে বা সাগাঁর সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য নেই। বলা যায়, ঝেরার দ্য নের্ভাল-এর ধারা, সেই 'হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনোখানের' আকৃতি! এক আশ্চর্য অপ্রত্যক্ষে বাস্তবকে মিশিয়ে দেওয়া। 'সিল্‌ভি' এবং 'ওরেলিয়া'র সুর।

গবেষকরা অনুসন্ধান ক'রে মোন-এর সঙ্গে আল্যাঁ-ফুর্নিয়েরের জীবনের মিল বের্ করেছেন। কাহিনীকারদের মুশকিল হল ঐ। তাঁরা কতখানি নায়ক-নায়িকার মধ্যে রয়েছেন তা জানবার জন্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। বিশেষত গ্রন্থকার যদি সতেরো আঠারো বছরের হন এবং গ্রন্থ যদি হয় **Le Diable au Corps** বা **Bonjour Tristesse** তাহলে কৌতূহল তো অদম্য। রাদিগে প্রতিবাদ ক'রে বলতে বাধ্য হন যে, তাঁর বই মোটেই তাঁর আত্মকথা নয়। সাগাঁও বলেছেন, তাঁর বই কেবল পর্যবেক্ষণ ও কল্পনার ফল। কথাটা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত। নিজের জীবনটাই কি মানুষের একমাত্র অভিজ্ঞতা? অন্য জীবনও কি তার অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত নয়? তাছাড়া, সহজাত বোধের প্রশ্নটাও সহজ নয়। যাই হোক, ফ্রাঁসোয়াজ্‌ সাগাঁর বিয়ে রেজিস্ট্রির সময় তাঁর বিভিন্ন বইয়ের নাম ও তাৎপর্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ ক'রে বেশ রসিকতা করেন মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট। ম্যাজিস্ট্রেট হলে কি হবে, ফরাসী তো। নিয়মমাফিক ভাষণ দেওয়ার সময় উপসংহারে তিনি নববধূকে সম্বোধন ক'রে বলেন :

Madame, j'espere qu'vaec un certain sourire, pas pour un mois ni pour un an, mais pour toujours vous direz : Adieu tristesse.

লেখিকার শেষ বইটা তখনও বেরোয়নি, বেরোলে তাও নিশ্চয় জুড়তেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের আশা সাগাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ফলেছে কিনা তা সাগাঁই জানেন, কিন্তু সাহিত্যে ফলেনি। যে-সুর তিনি ইতিপূর্বেই শুনিয়েছেন তা যেন আরো চেপে বসেছে তাঁর শেষ বই **Aimez-vous Brahms**-এ। এ থেকে তাঁর মনের আর উদ্ধার আছে

ব'লে মনে হয় না। কারণ এবার লেখিকা তাঁর পঁচিশ বছর বয়সে তরুণী নায়িকা থেকে প্রৌঢ়া নায়িকায় পৌঁছেছেন (অতঃপর কি বৃদ্ধার জীবন-কথা?)। প্রেমের খেলা-করা প্রেমহীন অভ্যাসের জীবন এবং তার পেছনে হতাশ্বাস প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, এই নিয়ে লেখা এ-উপাখ্যান প্রচুর শ্রোতা যে পাবে তাতে সন্দেহ নেই।

বোঝা যাচ্ছে সাগাঁর কণ্ঠস্বরের প্রসার নেই; এক সরু রেখা বেয়ে তা ব'য়ে চলেছে। কিন্তু ঐ ক্ষীণ পরিসরের মধ্যে তাতে চমৎকার কাজ আছে। তাঁর জীবনদর্শন এবং তাঁর কাহিনীতে শয়ন-ঘটনার প্রাদুর্ভাব (তাঁর জনপ্রিয়তার যা নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ) যতই ক্লেশকর লাগুক তাঁর ক্ষমতাকে অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। জীবনধারণটা একঘেঁয়েমি তা সত্ত্বেও জীবনধারণ করতে হয়, প্রেম অপ্রাপ্য তবু প্রণয় ক'রে যেতে হয়—এই এক ধরনের ক্লান্তির চিত্রণে সাগাঁর দক্ষতা অনন্য। এ-অনন্যতায় ভাষার দান কম নয়। তাঁর ভাষা সংহত এবং ধ্বনি ও ব্যঞ্জনায় কাব্যলক্ষণাক্রান্ত। সহজ পরিমিত কথায় সূক্ষ্ম জটিল অনুভবকে প্রকাশ করতে তিনি সমর্থ। সাগাঁর ক্ষমতার স্পষ্ট পরিচয় প্রথম বইতে পাওয়া গিয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে সমুদ্রকূলের দৃশ্যটা: আন্, বাবা আর এল্‌সা শুয়ে আছে, সেসিল্-এর মনে আগামী সংঘাতের ছায়া পড়েছে; জলের তলা থেকে তার সেই লাল নীল রঙের একটা ঝিনুক কুড়োনো, যে-ঝিনুকটা এখনো তার কাছে আছে এবং যেটা দেখলে তার কান্না পায়। আন্-এর চলে যাওয়ার দৃশ্য, **Ma pauvre petite fille** ব'লে এক মুহূর্ত সেসিল-এর গালে হাত রাখা—অল্প কয়েকটা আঁচড়ে খুব নাড়া-লাগানো ছবি। এবং বইয়ের শেষের বর্ণনা: পুরোনো অভ্যাসের পুনরাবৃত্তির মধ্যে অন্য বড় কিছুর কথা মনে পড়া, দুর্বোধ্যভাবে আন্ যার প্রতীক। শেষ গ্রন্থেও প্রমাণ পাওয়া গেল লেখিকার ক্ষমতা অটুট রয়েছে।

চার

কিন্তু এ সবই হল প্রচলিত ধারার সাহিত্য। অল্পবয়সী ক্ষমতার তারিফ করা যেতে পারে, কিন্তু নতুনত্ব কী আর এনেছেন এ সব লেখক? মোটামুটি পুরোনো পথেই পরিভ্রমণ। অন্য যাঁরা লিখছেন এবং অধুনা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন অর্থাৎ যাঁদের বই কাটে খুব, তাঁরা কেউ ব্যতিক্রম ন'ন। যেমন

মিশেল দ্য সঁ্যা-পিয়ের, এর্ভে বাজ্যাঁ মরিস দ্রুয়ঁ, ঝাঁ উগ্‌রঁ, ফেলিসিয়্যাঁ মার্সো ইত্যাদিরা। গতানুগতিক ধারাতেই সকলে চলেছেন, হয় বালজাক নয় স্ত্যাঁদাল নয় ফ্লোবের নয় জোলা, এই সব উনিশ শতকী মহারথীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। কিছু ঘটনা আর কিছু নরনারী; তাই নিয়ে একটি কাহিনী। কিন্তু নতুন যুগে নতুন আবিষ্কার প্রয়োজন। এতএব এখন শুরু হয়েছে ফ্রান্সে Nouveau Roman (নব্য উপন্যাস) আন্দোলন: এ-আন্দোলনের দুই নেতা আলঁ্যা রব্‌-গ্রীয়ে এবং মিশেল বুতর ফরাসী উপন্যাসের আসর ইতিমধ্যেই সরগরম ক'রে তুলেছেন। তার একটা বিশেষ কারণ এই যে, তাঁরা একাধারে ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। শুধু নব্য উপন্যাস লিখেই তাঁরা ক্ষান্ত ন'ন, নব্যতার প্রয়োজন, পদ্ধতি ও আদর্শ সম্বন্ধে প্রবন্ধও লিখে চলেছেন। এবং দুজনেই সুপণ্ডিত ও সুলেখক। বয়স যদিও চল্লিশের নিচে তবু তাঁরা চিন্তা করেছেন প্রচুর। কাজেই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাঁদের উপেক্ষা করতে পারছেন না: দুজনের মধ্যে মতের তফাৎ আছে, কিন্তু এক বিষয়ে তাঁরা একমত: এ-যুগে সনাতন পদ্ধতিতে উপন্যাস লেখা অর্থহীন।

প্রাক্তন ইঞ্জিনীয়ার রব্‌-গ্রীয়ে মনস্তত্ত্বকে সরাসরি জাহান্নমে পাঠিয়েছেন। কারণ তিনি চরিত্রকেও স্বীকার করেন না, কাহিনীকেও না। উপন্যাসে ও দুটোর কোনোটাই থাকবে না। জগৎ-সত্যের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি বুঝেছেন যে, বস্তুর দৃষ্টিগ্রাহ্য অস্তিত্বই সব এবং মানুষকেও সেইভাবে দেখা দরকার। তাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে যাওয়া গাঁজাখুরি ব্যাপার। বালজাক, ফ্লোবের, জোলা প্রভৃতি গল্প আর চরিত্র সাজিয়ে উপন্যাস লিখে গিয়েছেন ব'লে চিরকালই সেইভাবে উপন্যাস লেখা হবে কেন? ও সনাতনী ছক ইতিপূর্বেই কিছু ঘায়েল হয়েছে প্রুস্ত ও অন্যান্যের হাতে। এখন ওটা সম্পূর্ণ ছঁটাই করা প্রয়োজন। নিয়মিত নেশা হিসেবে গল্প গিলে গিলে পাঠকদেরও এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে যে তারাও ধ'রে নিয়েছে উপন্যাস মানেই ঐ উনিশ শতকী ছাঁচ। অন্য কিছু হলে তাদের এখন হয়তো মনঃপূত হবে না, না হোক। ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য ও দায়িত্ব হল জগৎ-সত্যকে রূপায়িত করা। সে-সত্য হল বস্তুর উপস্থিতি। কিন্তু গল্প আর চরিত্র না থাকলে কী থাকবে উপন্যাসে? কেন, বাস্তব জগৎ। যা চোখে দেখতে পাচ্ছি তাই, যেটুকু যেমন দেখতে পাচ্ছি তাই।

দর্শনের প্রাক্তন ছাত্র বুত্যর-এর বক্তব্য অপেক্ষাকৃত জটিল। তথাকথিত চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব চিত্রণ তাঁর কাছেও অগ্রাহ্য। দৃশ্য বস্তু ও ঘটনাকে প্রাধান্য দেবার তিনিও পক্ষপাতী, সাধারণ অর্থে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক সব কিছুকে। তবে রব্-গ্রীয়ের মতো কাহিনীকে একেবারে বাতিল করতে হবে এ তাঁর কথা নয়। কাহিনী থাকুক একটা সূত্র হিসেবে। এবং বস্তুর উপস্থিতিকে তিনি রব-গ্রীয়ের মতো সর্বস্ব ব'লে মানেন না। বস্তুর বাস্তবতাকে অবলম্বন ক'রে তার মাধ্যমে বস্তু-অতিক্রমী সত্যকে খোঁজা তাঁর লক্ষ্য। তিনি **phenomenology**-র উল্লেখ ক'রে দর্শনের সঙ্গে বিশেষ পদ্ধতিতে নিয়মিত বস্তু বর্ণনার দ্বারা উপন্যাসের সাযুজ্য স্থাপনের কথা বলেছেন। বুত্যর-এর মতে উপন্যাস হল এক গবেষণা। তিনি এক প্রবন্ধে বলেছেন বটে যে, "বর্তমান কালে উপন্যাস অনিবার্যভাবে এক নতুন ধরনের মহাকাব্যের দিকে চলেছে" তবু তাঁর বক্তব্যে গবেষণা-প্রক্রিয়ার উপরই জোরটা বেশি।

কিন্তু **the proof of the pudding is in the eating**। এই দুই উপন্যাস-তাত্ত্বিক উপন্যাস কী রকম লিখছেন সেটাই আসল কথা। সেই কথাতেই আসা যাক।

ধরুন রব-গ্রীয়ের সাম্প্রতিক উপন্যাস **Dans le Labyrinthe**। গোটা বই খুঁজে ঘটনা হিসেবে যা বের করা যায় তা এই: লড়াই থেকে পলাতক এক সৈনিক কোনো শহরে একজন লোককে খুঁজছে। তখন বরফ পড়ছে। সৈনিকের মৃত বন্ধু তাকে একটি প্যাকেট দিয়েছে, সেটি ঐ লোককে দিতে হবে। এক বালক তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে। সৈনিকটি কাফেতে যায়, হাসপাতালে যায়। আবার রাস্তা দিয়ে এলোমেলো চলে। এমন সময় টহলদার ফৌজের গুলি লেগে সে মারাত্মক আহত হয়। অতঃপর সে মারা যায়। এ সব ব্যাপার নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে বলা হয়নি এবং মুখ্যভাবেও বলা হয়নি। শহর দেখা যাচ্ছে, বরফ পড়ছে, রাস্তায় সৈনিক ও ছেলেটি, সৈনিকের হাতে একটি বাক্স—এ সবের বর্ণনা এবং অল্প কথাবার্তা। তারপর এক ঘরের বর্ণনা। মনে হয় যেন যিনি এ সব দেখছেন ও শুনছেন অর্থাৎ কথক, তাঁরই ঘরের বর্ণনা। সেখানেও ঐ রকম একটি বাক্স, দেয়ালে ছবি, ছবিতে তিনজন সৈনিক। এ সবেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। আবার সৈনিক, বালক। আবার রাস্তা। কিন্তু এ কি সেই রাস্তা? একটি স্ত্রীলোকের ঘরে সৈনিকটি গিয়েছিল, আহত হওয়ার পর আবার তার ঘরেই তাকে নিয়ে

যাওয়া হয়, কিন্তু এবার সে-ঘর যেন আগের ঘর নয়, এ যেন কথকের ঘর। সৈনিকটি যখন মারা যায় তখন সে খুঁটিয়ে চার পাশের জিনিষগুলো দেখতে থাকে। বাতি, চেয়ার, মাছি, একটা বড় ছবি। সে আগে যে সব লোককে দেখেছে তাদের সঙ্গে ছবির মানুষদের এমন মেশামেশি হয়ে যায় যে, আর বোঝা যায় না লেখক তাঁর উপন্যাসের মানুষদের কথা বলছেন, না ছবির মানুষদের। বইতে সমস্ত কিছুর বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খ, কিন্তু তা যেন অস্থায়ী, পরের বর্ণনায় নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হয়। যে সব মানুষ আছে তাদের যেন মুখ নেই, কারণ মানুষ তো দেখেন না গ্রন্থকার, দেখেন (তাঁর ভাষায়) "বস্তু, ভঙ্গি, কথা আর ঘটনা।" দৃশ্যের পর দৃশ্যের যেন এক গোলকধাঁধা (বইয়ের নামও তাই), প্রবেশ নির্গমনে আর তফাৎ করা যায় না, এক মূর্তির সঙ্গে আর এক মূর্তির।

জীবন ও জগৎ কি এই? রব্-গ্রীয়েের দৃষ্টি তাই বলে। রাসিন্ এ গোলোকধাঁধা দেখতে পাননি। তাঁর জানা ছিল পৌরাণিক গোলোকধাঁধার কথা। তাই তিনি নায়ক নায়িকা তৈরি করতে পেরেছিলেন এবং নায়িকাকে দিয়ে বলিয়েছিলেন :

Et Phedre au Labyrinthe avec vous descendue
Se serait avec vous retrouve e ou perdue.

কিন্তু এ সাক্ষাৎ গোলোকধাঁধার মধ্যে কোনো ফেদর্ কোনো ইপোলিৎ-এর অস্তিত্ব নেই, কারো সঙ্গে কেউ নেই, সব কিছু হারিয়েই আছে।

ধরুন ব্যুতর-এর একটি উপন্যাস। **La Modification**। ব্যুতর কাহিনীর বিরোধী ন'ন। সেটা এই : বিবাহিত লেয়ঁ দেলমঁ সেসিল-এর সঙ্গে প্রণয়-সম্পর্কিত। সে পত্নী আঁরিয়েৎ-কে ত্যাগ ক'রে প্রণয়িনীকে বিয়ে করবার অভিপ্রায়ে তাকে নিয়ে আসবার জন্যে প্যারিস থেকে ট্রেনে ক'রে রোমে যায়। কিন্তু সেখানে পৌঁছে সে-ইচ্ছে তার আর থাকে না, সে বিবাহিত জীবনেই ফেরে। অতি সাধারণ গল্প। কিন্তু সেটা আসল ব্যাপার নয়। বরং গল্পটা যেন একটা ওজর। উপন্যাসের আসল হল ভিতরকার বর্ণনা ও বিন্যাস। দেলমঁ প্যারিস-রোম ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় চলেছে। কামরার চুলচেরা বিবরণ লেখক দেন। জিনিষপত্র মানুষ সব কিছুর। তারপর নতুন নতুন যাত্রীর নামা-ওঠা, জানলায় বৃষ্টির ছাট, মেঝের উপর বিস্কুটের

গুঁড়োর থরথরানি ইত্যাদির বিবরণ। অতঃপর দেলম' প্যারিস-রোম পথে তার আগেকার ভ্রমণগুলো মনে করতে থাকে; তার সঙ্গে বর্তমানের দ্বিশ্রী কামরাটার তুলনা আসে, সে-সব ভ্রমণের ব্যর্থতা ও সার্থকতার কথা আসে, সেসিল ও আঁরিয়েৎ-এর ভূমিকার কথা আসে। কুঁকড়ে-মুকড়ে ব'সে থাকতে থাকতে দেলম'র শরীরে টাটানি ধরে। তারও বিস্তারিত বর্ণনা। অতঃপর তার তন্দ্রা এসে যায়। সে দুঃস্বপ্ন দেখে। রোম ও প্যারিসের মধ্যে দ্বন্দ্বের। ইতিহাস ও পুরাণের কাহিনী-মণ্ডিত রোম দেখা দেয় যেন উপন্যাসের এক মস্ত বড় চরিত্ররূপে, তার সামনে দৈনন্দিন জীবনের প্যারিস। দেলম' প্রশ্ন শোনে : "কে তুমি, কী চাও তুমি?" শেষ পর্যন্ত দেলম যখন প্রণয়িনীর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে না তখন কিছু আর যায় আসে ব'লে মনে হয় না, কারণ কাহিনী ততক্ষণে বাস্তবের বিভিন্ন রূপ পরিবর্তনের নাটক হয়ে গিয়েছে, যাতে পাঠকও জড়িয়ে পড়েছে। তা আর দেলম'র গল্প নয়। দ্বিতীয় পুরুষে vous সম্বোধনে প্রথম থেকে ঘটনা বিবৃত করা তার একটা প্রকরণও বটে।

ব্যুতর-এর উপন্যাসের বক্তব্য নিয়ে নানা ব্যাখ্যা। সেটা মহৎ কিছুরই একটা লক্ষণ নিশ্চয়। কেউ বলেছেন, দেখা বাস্তব ও বাঁচা বাস্তব অতিক্রম ক'রে যে অন্য এক বাস্তব আছে তা আমাদের দ্বারা ব্যুতর স্বীকার করিয়ে নেন এই বইতে। কেউ বলছেন, স্থান ও সময়ের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষকে লেখক দেখিয়েছেন সেই বন্দীদশা থেকে সে বেরোতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। বইটা যে রনোদো পুরস্কার পেয়েছিল সে সম্পর্কে একজন ব্যুতর-ভক্ত উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন, বলেছেন, বিচারকরা ভুল ক'রে এ-উপন্যাসকে মনস্তাত্ত্বিক ভেবেই পুরস্কারটা দিয়ে ফেলেন।

পাঁচ.

কিন্তু এর পরেও কথা থাকে।

এমন উপন্যাসও লেখা হতে পারে যার সামনে এই সব প্রেমতত্ত্ব শিল্পতত্ত্ব অবাস্তব হয়ে যায়। এমনকি বইটা খাঁটি উপন্যাস হল কি না সে-প্রশ্নও জাগে না। জীবন যেন তার প্রকাণ্ড প্রবলতা নিয়ে উঠে আসে বইয়ের পাতায়—যন্ত্রণার ভালোবাসার মৃত্যুর প্রবলতা নিয়ে। সে-বই যেন রক্ত দিয়ে লেখা এবং রক্তেই তার ডাক পৌঁছয়।

এই জাতের একটি বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, যা নিয়ে ফ্রান্সের পাঠক ও সমালোচক মহল এখনো বিহ্বল হয়ে আছেন। বইয়ের নাম **Le Dernier des Justes**। লেখকের নাম আঁদ্রে শোয়ার্জ-বার। লেখার আগে লেখকের পরিচয় এ-ক্ষেত্রে জানা আবশ্যক, কারণ দুয়ের সম্পর্ক অনন্যসাধারণ।

আঁদ্রে শোয়ার্জ-বার ইহুদী। তাঁর বাবা মা পোল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন এবং ১৯২৪ সালে ফ্রান্সে এসে বসবাস স্থাপন করেন। ফ্রান্সেই আঁদ্রের জন্ম হয় ১৯২৮ সালে। মফঃস্বলের ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পর ছোটবেলাতেই তিনি ইহুদী ব'লে বৈষম্য টের পান। মহাযুদ্ধ যখন বাধে তখন তাঁর বয়স এগারো। সেই সময় জাহাজে মাস ছয়েক ছোকরা-খালাসীর কাজ করেন। তার আগে ১৯৩৮ সালে সাংসারিক অনটনের কারণে ইস্কুলের পর রাস্তায় খবরের কাগজ বেচতেন। জার্মানরা যখন ফ্রান্সে অভিযান করল তখন ইহুদীরা ভেতর দিকে স'রে গেল, শোয়ার্জ-বাররা গেলেন আঁগুলেম-এর সন্নিকটে। আঁদ্রে ফিটার-এর কাজ শেখার জন্যে শিক্ষানবীশ হলেন। কিন্তু পুরো এক বছর শিক্ষা নিতে পারলেন না। কেন? আঁদ্রে শোয়ার্জ-বার'এর মুখেই শোনা যাক: "একদিন বাড়িতে ফিরে এসে দেখলাম আমার বাবা মা আর দিদিকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেছে। বাড়িতে শুধু রয়েছে আমার তিনটি ছোট ভাই। সবচেয়ে ছোটর বয়স তখন তিন বছর। আমার নিজের বয়স তখন চোদ্দ। তাদের খাওয়ানো পরানো মানুষ করার জন্যে খামারে কাজ নিলাম। মা যে কেমন ক'রে রান্না করত তা তো ভালো-ভাবে আগে লক্ষ্য করিনি; মনে আছে ভাইদের জন্যে একদিন এমন তরকারি বানিয়েছিলাম যা গলধঃকরণ করতে বেশ মনোবল লাগে। আমার বাবামাকে আর কখনো দেখতে পাইনি। প্রতিরোধ-সংগ্রামে এবং পরে সেনাদলে যোগ দিয়েছিলাম। যুদ্ধশেষে তা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর প্যারিসে উপস্থিত হলাম। রোজ লুতেসিয়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। জার্মান বন্দীশালা থেকে যত লোক উদ্ধার পেত সেখানেই এসে পৌঁছত। একদিন আমাদের জানিয়ে দেওয়া হল যারা ফেরেনি তারা আর ফিরবে না।"

তারপর "না ভাববার জন্যে" পড়তে শুরু করলেন শোয়ার্জ-বার। কেবল গোয়েন্দা-কাহিনী। ভুল ক'রে একদিন প'ড়ে ফেললেন ডস্টয়েভস্কির 'অপরাধ ও শাস্তি'। সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। চিন্তা ও অধ্যয়নের আগ্রহ জাগল। নিজে নিজেই পড়াশুনো ক'রে পরীক্ষা দিলেন, ভালোভাবে পাস ক'রে বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে যেতে না যেতেই বিতৃষ্ণা জন্মাল—ডিপ্লোমা আর চাকরি ছাড়া চারপাশে আর কোনো লক্ষ্য দেখলেন না। কিন্তু এ-বিতৃষ্ণা স্থায়ী হয়নি। শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব ক'রে আবার ভরতি হলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তাঁর অধীত বিষয় সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, দর্শন। অধ্যয়নের সঙ্গে কাজ বরাবরই ক'রে এসেছেন—সেই 'ফিটার'-এর কাজ। ইতিমধ্যে পৃথিবীকে নিজের দৃষ্টিতে ধরবার এবং কিছু কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল। সেই কারণে কাগজ কলম নিয়ে বসছিলেন। ফলে ক্রমে ক্রমে দেখা দিল ভাবনার চেহারা—কাহিনী, মানুষ। অবশেষে এই বই।

বইটি ইহুদীদের নিয়ে লেখা। শতাব্দীর পর শতাব্দী খ্রীস্টান পাশ্চাত্ত্যে এ জাতির ভাগ্য যে রক্ত অশ্রু আর উৎসর্গের প্রবাহে ব'য়ে এসেছে তার কাহিনী। বইয়ের প্রথমে কিম্বদন্তী আর মধ্যযুগীয় ইতিহাসের আখ্যান, ক্রমে আধুনিক-কালের পটোত্তোলন। ইহুদীদের মধ্যে একটা কিম্বদন্তী অথবা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যার মর্ম এই যে, পৃথিবী নির্ভর করবে ছত্রিশজন বিধাতা-নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা **Juste**-এর উপর, প্রত্যেক পুরুষে একজন **Juste** জন্মাবেন, ইহুদীজাতি তথা মানবজাতির দুঃখ যন্ত্রণা ও অবমাননার বোঝা বহন করবার জন্যে এঁরা মনোনীত। লেখক পুরোহিত ইয়ম টম লেভি থেকে এই পরম্পরা কাহিনীতে এনেছেন। ১১৮৫ খ্রীস্টাব্দে ইয়র্কের ইহুদীরা খ্রীস্টানদের দ্বারা এক গম্বুজে অবরুদ্ধ হয়েছিল। ইয়ম টম লেভি আত্মসমর্পণের পরিবর্তে সপ্তম দিনে স্বহস্তে সঙ্গীদের কণ্ঠচ্ছেদন ক'রে নিজে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু তাঁর এক ছেলে আশ্চর্যভাবে বেঁচে গিয়েছিল, সুতরাং উত্তরাধিকার টিঁকে রইল। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পুরুষে তার পরিচয় পাওয়া গেল। এই পরম্পরার সর্বশেষ ব্যক্তি হল এর্নি লেভি, আমাদের কালের লোক, এ-বইয়ের নায়ক। **Juste** যে সব সময় পুরোহিত অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তি হবেন তা নয়, তিনি অতি সাধারণ মানুষ হতে পারেন, এমনকি হাস্যকর মানুষও। কিন্তু ভারটা তাঁর উপর এসেই পড়বে। এর্নি এই রকম অতি সাধারণ মানুষ। ১৯১৫ সালে পোল্যাণ্ডে কসাকরা যখন ইহুদী-নিধন শুরু করে তখন এর্নির ঠাকুরদা (উনশেষ **Juste**) তাঁর লোকজনদের নিয়ে চ'লে আসেন জার্মানীতে। সেখানেই এর্নি জন্মগ্রহণ করে। তারপর হিটলারবাদের অভ্যুদয়, ইস্কুলে শিক্ষক ও সহপাঠীদের দ্বারা এর্নির নির্যাতিত হওয়ার অভিজ্ঞতা, সেই কিশোর বয়সে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা। যে-হত্যা থেকে বাঁচবার জন্যে তারা জার্মানীতে এসেছিল সেই হত্যা তাদের ঘিরে ধরে।

অতঃপর তারা চ'লে আসে ফ্রান্সে। কিছুকাল পরে মহাযুদ্ধ বাধে, এর্নি করেন লিজন-এ নাম লেখায়। নাৎসী অভিযানের পর এর্নির আত্মগোপন, অবশেষে গ্রেপ্তার। ইতিমধ্যে তার জীবনে প্রেম এসেছে—অবধারিত মৃত্যুর সামনা-সামনি সেই আলোটা জলতেই থাকে। গোল্দার সঙ্গে সে মরতে যায়—ফাঁসি থেকে পরিশেষে আউসভিৎস্-এর গ্যাসঘরে। শেষ দৃশ্যটা সম্মিলিত মরণ-যাত্রার। অন্য কয়েদীরা তাদের সাথীদের এই যাত্রাপথে জার্মান পিতৃভূমির গৌরবসঙ্গীত বাজাচ্ছে। গাড়ির মধ্যে বাচ্চাগুলো ভয় পেয়ে এর্নিকে আঁকড়ে ধরেছে, গোল্দাও ভয় পেয়েছে। এর্নি সবাইকে সান্ত্বনা দেয়, বলে তারা সবাই এক সঙ্গে পুণ্যবানদের রাজ্যে প্রবেশ করতে চলেছে, উৎকৃষ্টতর জগতে। সে নিজে তা বিশ্বাস করে না, তবু মিথ্যে কথা বলে।

অমানুষিকতায় মর্মান্তিক এবং প্রেমে অপরূপ আমাদের এই পৃথিবীর এক বিশাল দৃশ্য শোয়ার্জ-বার উন্মোচন করেছেন। অভিভূত হয়ে কেউ এ-বইকে "শতাব্দীর গ্রন্থ" ব'লে অভিহিত করেছেন। **Le Dernier des Justes** মনুষ্য-বিবেককে উন্মথিত করেছে। খ্রীস্টান জগৎ এই খ্রীস্টধর্মবিগর্হিত আচরণ কেন ক'রে এসেছে, এ-প্রশ্নের তাৎপর্য গভীর ও ব্যাপক। ধর্মান্ধতায় এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, জাতিগত অহঙ্কারে কারণ খুঁজতে হয়। নইলে আজ যখন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচার শিথিল তখনো এ-অত্যাচার কেন? ইহুদী না থাকলেও খুব তারতম্য হত ব'লে মনে হয় না, অন্য জাতিরা ছিল। প্রকৃতপক্ষে নিগ্রো, রেড ইণ্ডিয়ান এবং অন্যেরা খ্রীস্টান পাশ্চাত্য জাতিদের হিংস্র অহঙ্কারের যথেষ্ট আস্বাদ পেয়েছে, এখনও পাচ্ছে। তদুপরি বর্তমানকালে যুক্ত হয়েছে রাজনীতির স্বার্থ। ক্ষমতা দখল করার ও হাতে রাখার খেলায় কাউকে নন্দ ঘোষ বানানোর দরকার হয়ই। সুতরাং ইহুদীদের যন্ত্রণার আর অবসান ঘটে না। হিটলারের পতনের এত বছর বাদেও অর্থাৎ এই বই যখন লেখা হল সে-সময়ও আবার দেয়ালে দেয়ালে দেখা দিয়েছে ইহুদীবিরোধী স্লোগান। কিন্তু শুধু পাশ্চাত্য জাতি ও ইহুদীতেই প্রশ্নটা নিঃশেষিত হয় না, সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়ের আচরণ তার আওতায় এসে যায়। শোয়ার্জ-বার এই সব ভাবনা পাঠকের মনে জাগ্রত করেছেন রক্তমাংসের মানুষের কথা ব'লে। এবং তাঁর এ-বলায় সাহিত্য-প্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষর পড়েছে।

বইটা এবার গঁকুর পুরস্কার পেয়েছে। অবশ্য সেটা তুচ্ছ কথা।

১৯৫৯

বর্তমান ফরাসী উপন্যাস

পটভূমি ও প্রবণতা

সাহিত্যের এক-এক যুগে কোনো এক বিশেষ প্রবণতা বেশ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, অনুসন্ধিৎসুরা তার সম্বন্ধে বিশেষভাবে কৌতূহলী হন। সে-কৌতূহল পাঠক-সাধারণকেও প্রভাবিত করে, তবে আলগাভাবে, কেননা সাধারণত ঐ লক্ষণা-ক্রান্ত সাহিত্যের সঙ্গে তাদের সরাসরি পরিচয় ঘটে সামান্যই, কিন্তু শুনে শুনে সংশ্লিষ্ট নাম-ধাম তাদের মুখস্থ হয়ে যায়। এই নামমাহাত্ম্য এতটা ছড়িয়ে প'ড়তে পারে যে, শেষ পর্যন্ত ঐ জানাটা, অন্তত সাময়িকভাবে, বৈঠকী সংস্কৃতির একটা চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। আর কার্যত সবচেয়ে আলোড়িত হয় সাহিত্য-উদ্দীপনায় অস্থির শিক্ষিত তরুণেরা যারা নতুন কিছু করতে চায়। বিদগ্ধ সাহিত্য-তাত্ত্বিক-দের সূক্ষ্ম আলোচনার আবহাওয়ায় তারা সেই বিশেষ আধুনিক প্রবণতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে উদ্যোগী হয়। অথচ এই একই সময়ে এই গণ্ডির বাইরে অগণ্য যে-সাধারণজন, তারা অন্য জিনিষ পড়ে। এটা এই কারণে হয় যে, নতুন কোনো ধারা দেখা দেওয়ামাত্র অন্য ধারাগুলো বা আগেকার ধারাগুলো দুর্বল হয়ে যায় না, তারা চলতেই থাকে এবং তাদের সঙ্গেই সাধারণ পাঠকের পরিচয় এবং আত্মীয়তা। অবশ্য হৈচৈটা হয় নতুনকে নিয়েই, বিশেষত বর্তমান যুগে যখন বক্তব্য প্রচারের উপায় এত বেশি।

কিন্তু এই নতুনত্ব, যার আর এক নাম প্রচার এবং যার উল্টো ক'রে আর এক নাম দেওয়া যায় গণ্ডিবদ্ধতা, এর নিজস্ব কোন অবধারিত গুণ নেই। এই নতুন তৎপরতা অসার না সারবান, পণ্ডশ্রমের এলাকা না সার্থক সৃষ্টির পথ, এর পুরোধারা বাস্তবিক প্রতিভাবান না কৌশলী খেলোয়াড়, তা একমাত্র সময়ই ব'লে দিতে পারে, আমাদের কাজ কেবল জল্পনাকল্পনার। অবশ্য চিনিয়ে দেবার সময়ের মেয়াদ বেশিও হতে পারে, অল্পও হতে পারে। তবে এ রকম নতুন প্রবণতার নিজস্ব সত্যিকার শিল্পমূল্য থাকুক বা না-থাকুক, তাদের তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যায় না। সমাজ-সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাদের জন্ম দেয়।

ফ্রাসের উপন্যাস-রাজ্যে যে-দৃশ্য আমরা বেশ কিছুকাল ধ'রে দেখছি, তাকে এই সমগ্র ব্যাপারটার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায়। সেখানে বছর কুড়ি আগে সবচেয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে "নুভো রমাঁ" (নব্য উপন্যাস) আন্দোলন। তার কণ্ঠ এখনো নিস্তেজ হয়ে পড়েনি, যদিও অভিনবত্বের প্রথম চমক কেটে গিয়েছে (যুগ থেকে যুগে কোন্ অভিনবত্বেরই বা না যায়? রেয়ালিস্ম্, নাত্যুরালিস্ম্, স্যুররেয়ালিস্ম্, একজিস্তাঁসিয়ালিসম্, একের পর এক। এবং আরো কত। এক কালে যা অভিনব পরবর্তীকালে তাই হয় গতানুগতিক)। "নুভো রমাঁ"র নেতৃস্থানে এসেছেন ক্রমে চারজন: নাতালি সারোৎ (জন্ম ১৯০২), আলাঁ রব-গ্রীয়ে (জন্ম ১৯২২), মিশেল ব্যুতর (জন্ম ১৯২৬) এবং ক্লোদ সিমঁ (জন্ম ১৯১৩)। এঁরা একই সঙ্গে 'নব্য উপন্যাসের' প্রবক্তা এবং রূপকার। এঁদের নিছক ঔপন্যাসিক না ব'লে উপন্যাস-বিজ্ঞানী বলাই বোধহয় বেশি যুক্তিসঙ্গত, কেননা এঁরা একদিকে গবেষণা করছেন, অন্যদিকে তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন। আগে কেউ যে এমন করেননি তা নয়। যেমন এমিল জোলা করেছেন নাত্যুরালিস্ম্ নিয়ে। তবে এতটা নয়। তাছাড়া, তাঁর বিরামহীন সৃষ্টির কাজ তাঁকে অত অবসরও দেয়নি। মতবাদ ছাড়িয়ে তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা অবিসংবাদী হয়ে উঠেছিল, যে-কথা সার্ত্র্ সম্বন্ধেও বলা যায়। সেদিক থেকে এই চতুর্মূর্তি এখনো প্রশ্ন-চিহ্নিত।

কিন্তু "নুভো রমাঁ"কে একটা সম্মিলিত আন্দোলন হিসেবে দেখলে ভুল হবে। নাতালি সারোৎ এবং অন্য তিনজন পরস্পরের মধ্যে সলাপরামর্শ ক'রে কিছু করেননি। নিজেদের মত ও পথের সিদ্ধান্ত তাঁরা পৃথকভাবেই নিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। তবে একটা সময়েই তাঁরা সরব হয়ে উঠেছেন, এবং একটা বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি ও আচরণ এক: প্রথাগত উপন্যাস-রীতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা। 'প্রথাগত' (**traditionnel**) শব্দটা অনিশ্চিত, কেননা এযাবৎ ফরাসী উপন্যাসে বৈচিত্র্য তো কম দেখা যায়নি। তবে আদিকাল থেকে উপন্যাস যে-ধারায় ব'য়ে এসেছে তাতে বৈচিত্র্যের মধ্যেও এমন কিছু সাধারণ লক্ষণ আছে যা সাধারণ পাঠকের মনে উপন্যাস-ধারণা গ'ড়ে তুলেছে। তার দ্বারা প্রথাগতকে চিহ্নিত করা যায়। এ বিষয়ে আলোচনায় অধ্যাপক ঝাক ল্যকাবুস্ যে-লক্ষণগুলোর উল্লেখ করেছেন সেগুলো আমরা মেনে নিতে পারি। লক্ষণগুলো এই: (১) ভাষা এবং বাক্যার্থ বুঝতে অসুবিধে হবে না, অর্থাৎ দর্শন বা বিজ্ঞানতত্ত্ব পড়তে গেলে যেমন মাথা ঘামাতে হয় সে

রকম মাথা ঘামাতে হবে না, সহজভাবে প'ড়ে যাওয়া যাবে ; (২) একটা ক্রমা-গ্রসর কাহিনী থাকবে, ঘটনার ঘনঘটা যদি নাও থাকে তবু ঘটনাচক্র কিছু থাকবে ; (৩) কিছু চরিত্র থাকবে যাদের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হবে এবং যাদের আচরণ ও কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে মনের যে-চেহারা ফুটে উঠবে তার সঙ্গে পাঠকের কোনো না কোনো আবেগের সংযোগ হবে, অর্থাৎ বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ঘৃণা, সহানুভূতি, বিরুদ্ধতা, আত্মীয়তাবোধ ইত্যাদি সৃষ্টি হবে ; (৪) কাহিনীর মধ্যে লেখক যদি নিজে কখনো মুখ বাড়ান, তাহলে তা কাহিনীকে বানচাল না ক'রে বরং আরো জোরদার করবে। এই ছাঁচকে "নুভো রমঁা"-পন্থীরা ভেঙে দিয়েছেন। তাঁদের কথা ও কাজ উপন্যাসের এক নতুন মূর্তি স্থাপনে নিযুক্ত।

কিন্তু ফরাসী উপন্যাস-ক্ষেত্রে এই পর্বের সামনে এলে আমরা দুটো ইতিহাসগত ব্যাপারকে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারি না। সে-দুটো পরস্পর-বিরোধী, কিন্তু "নুভো রমঁা"র হৈচৈ সত্ত্বেও তাদের ভূমিকা অস্বীকার করবার উপায় নেই। প্রথমটা হল এই যে, উপন্যাস সম্বন্ধে ভিন্নপন্থী চিন্তা ও উদ্যম আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবং দ্বিতীয়টা হল এই যে, অন্যান্য ধারা, যারা প্রথাগতের মূল স্রোত থেকে নির্গত, বেগবানভাবে ব'য়ে চলেছে। "নুভো রমঁা"র সবচেয়ে চিৎকৃত প্রাথমিক প্রকাশকাল ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ এই পাঁচ বছর (এর পরও অবশ্য তা সক্রিয় আছে)। কিন্তু উপরে যে দুই দলের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের প্রথম দল অর্থাৎ যাঁরা প্রথা ভাঙার অগ্রদূত তাঁরা এর আগেই যেমন লিখেছেন, তেমনি এই সময়ে লিখেছেন এবং এই সময়ের পরেও লিখছেন। দ্বিতীয় দলের লেখকেরাও অর্থাৎ যাঁরা প্রথার বাইরে নন তাঁরাও নানা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নিয়ে এই সময়ের আগে, মধ্যে এবং পরে লিখেছেন এবং লিখছেন।

উপন্যাস নামক সাহিত্যিক রচনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ অনেক আগেই শোনা গিয়েছে, বিশেষত কবিদের মুখ থেকে। আর 'রেয়ালিস্‌ম্' ও 'নাত্যুরালিস্‌ম্'-এর পর প্রথাগত উপন্যাসরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা এই শতাব্দীর গোড়া থেকে পর পর অনেক ঔপন্যাসিকই তুলেছেন। মার্সেল প্রুস্ত-এর বিরাট উদাহরণ তো উজ্জ্বল হয়ে আছে। পদ্ধতিপ্রকরণে আঁদ্রে জিদও খানিকটা দৃষ্টান্তস্বরূপ রয়েছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় ঝাঁ-পল সার্ত্র্‌ উপন্যাসে ধরাবাঁধা তথাকথিত বাস্তবতার বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানেন। তাঁদের সকলের

হাতেই বরাবরকার উপন্যাস-রীতির অদলবদল হয়। আসলে বাস্তবতার ধারণা সম্পর্কেই যত বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ। এই সব লেখক, বিশেষত "অস্তিত্ববাদী" নামে অভিহিত লেখকেরা উপন্যাসের কাহিনী, বিবরণ, চরিত্র ও শৈলী ঢেলে সাজিয়ে পৃথিবী, সমাজ এবং মানব-ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এক নতুন ধারণা প্রকাশ করতে চান। এর আগে এবং কতকটা এর পাশাপাশি লুই-ফের্দিনাঁ সেলিন, ঝর্ঝ বাতাই, ঝাঁ পলর্আঁ, আঁরি মিশো, ফ্রাঁসিস পঁঝ, রেঁম ক্যনো প্রভৃতি কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিকেরা ভাষা বস্তুটাকে মানুষ ও পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে অনুসন্ধান চালান, অর্থাৎ প্রকাশ-মাধ্যমের উপর তাঁরা গুরুত্ব দেন বেশি, অবশ্য তার সঙ্গে পাঠককে নাড়ানোর প্রশ্ন স্বভাবতই জড়িত ছিল। সেলিন ও ক্যনো কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষার মধ্যে সমস্ত রকম ব্যবধানই ঘুচিয়ে দেন। পরে ক্রমে ক্রমেঔপন্যাসিকের ভাষার নির্মিতিকেই উপন্যাস-পাঠকের অনুধাবনের বস্তু ক'রে তোলা হল, যার পরীক্ষণ আমরা "নুভো রমাঁ"র পর এক দল তরুণ লেখকের রচনায় দেখতে পেয়েছি।

১৯৫০-এর এ-ধার ও-ধারের সময়টা ফরাসী উপন্যাসের বিবিধ বিচিত্র তৎপরতার এক সন্ধিকাল। ১৯৫৩ সালে বেরোয় রব-গ্রীয়ের **Les Gommes** এবং নাতালি সারোৎ-এর **Martereau**। এর পরের বছরই ফ্রাঁসোয়াজ সাগাঁর (জন্ম ১৯৩৫) অভ্যুদয়। তাঁর প্রতিভার তারিফে তাঁর অল্পবয়সের বিবেচনাটা অবশ্যই ছিল। সাগাঁ প্রচলিত ধারার অনুগামিনী। যদিও তাঁর বক্তব্যে গভীরতা বা প্রসার নেই, তবু তাঁর লিখন-ক্ষমতা সংশয়াতীত। জীবন-ধারণের একঘেয়েমি এবং প্রেমের মরীচিকার পেছনে ছোটা তাঁর রচনার মূল কথা। তাকেই তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন উপন্যাসে দেখিয়েছেন, যার মধ্যে তাঁর মাত্রাজ্ঞান এবং প্রকাশক্ষমতার প্রমাণ মেলে। এ-ধরনের উপন্যাস যেন সার্ত্র্‌-প্রবর্তিত **littérature engagée**-র বিপরীত প্রতিক্রিয়া। এই ধারায় যার নাম নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনি রজে নিমিয়ে (জন্ম ১৯২৫)। গা-ছাড়া ভঙ্গি (ফরাসীতে যাকে বলে **désinvolture**) তিনি নিয়ে এলেন উপন্যাসে। যেমন ইচ্ছে ব'লে যাও, যা খুশি মন্তব্য করো, ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীর সব মূল্যবোধকে বিদ্রূপ করো, লেখার নেশায় লিখে যাও— এই তাঁর প্রবর্তনা। যদিও নিমিয়ে সাহিত্যকে **dégagée** করবার ভাব দেখালেন, ঝুঁকলেন কিন্তু দক্ষিণপন্থার দিকে। (যুক্তিসঙ্গতভাবে সেটাই ছিল অপরিহার্য পরিণতি, হয়তো বা প্রচ্ছন্ন লক্ষ্যও। সব **dégagement**-র মূলেই

তাই, অন্তত বর্তমান কালে, যেমন Art for art's sake)। তাঁর Les Epées এবং Le Hussard bleu (১৯৪৯ ও ১৯৫০), এই জোড়া উপন্যাসে তিনি নাৎসী-পদানত ফ্রান্সের এক প্রতিরোধ-সংগ্রামীকে ক্রমে বানালেন পেতাঁ-লাভালের পাইক, পরে তাকে বানালেন সৈনিক, যে পরাজিত জার্মানী দখল করল। প্রকারান্তরে তিনি দেশপ্রেমের বদলে আত্মবিক্রয়কেই সমর্থন জানালেন। Le Hussard bleu-র শেষ কথা কয়টি যেন তাঁর নিজেরই কথা: "বাঁচা, ওদের মধ্যে আমার এখনো কিছুকাল বাঁচার কথা। যা কিছু মানবিক তা আমার কাছে বিজাতীয়।" অবশ্য বেশিদিন তাঁকে বাঁচতে হয়নি। এর অল্পকাল পরে নিমিয়ে আত্মহত্যা করেন (প্রথমে শোনা যায় তিনি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন, পরে জানা যায় সে-দুর্ঘটনা আত্মহত্যা)।

এই ধারার কিছু লক্ষণ, যথা বিশ্লেষণ-প্রবণতা, বেপরোয়া ভাব, যৌনতার ঝোঁক অন্য লেখকদের মধ্যেও আছে, যেমন রজে ভাইয়াঁ (জন্ম ১৯০৭, মৃত্যু ১৯৬৫)। কিন্তু ভাইয়াঁর লেখক-চরিত্র বিশিষ্ট এবং বেশ বিস্ময়কর। প্রথানুসারী হয়েও তিনি এতরকম প্রভাব ও প্রবণতা নিজের মধ্যে সম্মিলিত করেন যে, তাঁকে শ্রেণীভুক্ত করা কঠিন। নিমিয়ের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য মৌলিক। অভিজাত মানুষ তাঁর আদর্শ, সেই সঙ্গে তিনি সহধর্মিতা খোঁজেন সাম্যবাদে। নিজেকেই যেন তিনি প্রসারিত করেন তাঁর নায়কদের মধ্যে, যারা যৌনতা এবং আদর্শ-বাদের মধ্যে আন্দোলিত হয়। প্রতিরোধ-সংগ্রামের উপর অত্যন্ত শক্তিশালী উপন্যাস লিখেছেন তিনি: Drole de Jeu (১৯৪৫)। Ses Mauvais Coups-তে (১৯৪৮) তিনি এক বৃদ্ধের প্রণয়-কাহিনী অবলম্বন ক'রে সমাজ ও নীতির ভিত ধ'রে টান দিয়েছেন। 325000 francs (১৯৫৫) উপন্যাসে ব্যক্তির ভাগ্যকে শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে জড়িত ক'রে দেখাতে চেয়েছেন, আবার ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র আভিজাত্যের গাথা লিখেছেন La Loi-তে (১৯৫৭)। তাঁর এই গতিশীল স্থিতিহীন মনের জন্যেই বোধ হয় তাঁর রচনা এত জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এই সময়টাতেই প্রচলিত ছাঁচ ভেঙে অগ্রসর হয়েছেন অন্য তরুণেরা। তাঁরা "নুভো রমাঁ'র আগেই বিভিন্নভাবে উপন্যাসের রূপ পাল্টাতে আরম্ভ করেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী বোরিস ভিয়াঁ বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর জন্ম ১৯২০ সালে। "নুভো রমাঁ"র দুই প্রবক্তার চেয়ে তিনি বয়সে ছোট। (আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নাতালি সারোৎ-ই বয়সে সবচেয়ে প্রাচীন)। কিন্তু ভিয়াঁর উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয় এঁদের আগে ১৯৪৭

সালে। তিনি মারা যান মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ১৯৫৯ সালে। এই স্বল্পকালের জীবনে তিনি বেশ কিছু উপন্যাস, নাটক ও গান লিখে গিয়েছেন স্বনামে এবং ছদ্মনামে। তাঁর ভাগ্যের পরিহাস এই যে, ছদ্মনামে তিনি মার্কিনী ঢঙে খুন-জখম অ্যাডভেঞ্চারের যে-কাহিনী লেখেন তা খুব জনপ্রিয় হয়, কিন্তু তাঁর নিজস্ব উপন্যাসগুলো উপেক্ষিতই থেকে যায়। তাঁর প্রতিভা আবিষ্কৃত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। ১৯৪৭-এ প্রকাশিত হয় ভিয়াঁর **L' Eoume des Jours** এবং **L'Automne a Pe'kin,** ১৯৫০-এ **L'Herbe rouge** এবং ১৯৫৩-এ **L'Arrache-coeur**। এই বইগুলোতে প্রথমেই আশ্চর্য ক'রে দেয় শব্দের ভোজবাজি আর দৃশ্য-কল্পনার অভিনবত্ব। তাঁর ভাষার ভেতর থেকে যেন শিশুকাব্যের তাজা রস উপচে পড়তে থাকে এবং তিনি এমন এক জগতে আমাদের নিয়ে যান যেখানে বস্তু ও জীবজন্তুরা অদ্ভুতভাবে থাকে, কথা বলে, ব্যবহার করে, যেখানে নিষ্ঠুরতা ও অপরূপতার বসবাস একসঙ্গে। কিন্তু এ সব উদ্ভট শিশুপাঠ্য কাহিনী ব'লে মনে হয় না, আমাদের এই জগতেরই অভিজ্ঞতাকে আমরা যেন সেখানে ছুঁতে পারি। কখনো দেখি প্রেম চূর্ণ হয় মৃত্যুর আঘাতে, কখনো দেখি প্রেম সম্ভবই হয় না এবং সব সময়ই দেখি এমন এক সমাজের ছবি যা স্বার্থপরতায় এবং অনাত্মীয়তায় ক্ষতবিক্ষত।

ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন ঝ্যুলিয়ঁ্যা গ্রাক (জন্ম ১৯১০) এবং আঁদ্রে পিয়ের দ্য ম'াদিয়ার্‌গ্ (জন্ম ১৯০৯)। যে-যুগে যশ ও অর্থের লোভে সাহিত্যিকরা নিজেদের বিকিয়ে দিতে রাজী, সেই যুগে গ্রাকের সাহিত্যিক চরিত্রে অসাধারণত্ব আছে। সাহিত্য-জগতে ব্যবসাদারী যোগসাজসকে তিনি চাবুক মেরেছেন ১৯৫০ সালে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় এবং নিজে ১৯৫১ সালে অর্থ ও যশের উৎস গঁকুর পুরস্কার নিতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর এই আপোষহীন মনোভাব হয়তো স্যুররেয়ালিস্ত আন্দোলনে তাঁর সংগ্রামের সূত্রে এসেছে। গ্রাক প্রথাগত উপন্যাসের কাহিনী-গঠন ও চরিত্র-নির্মাণ প্রথম থেকেই বাতিল করেছেন। তিনি উপন্যাসে যে-স্থান অথবা যে-আবহাওয়ার অবতারণা করেন, তা কাহিনী বিবৃত করার পটভূমি হিসেবে আসে না, তা যেন কাহিনী সৃষ্টি করে। কোনো ঘটনার লক্ষণ সেখানে দেখা দেয়, যা মনে হতে পারে অন্তিম পর্ব অথবা এক পুনরারম্ভ। প্রতীক্ষার একটা মূল সুর তাঁর সব উপন্যাসেই পাওয়া যায়। "ধরাবাঁধা কোনো আবেগ-অনুভূতি নয়, কামনার, মুগ্ধতার এবং মৃত্যুর তলদেশের প্রবল তরঙ্গ। খুঁটিনাটি

বিবরণ নয়, চিত্রকল্পসমৃদ্ধ গদ্যে এক দীর্ঘ কবিতা, যার মধ্যে আশ্চর্য ক্রমে ক্রমে আকার নেয়।"—ফরাসী সমালোচকের এই উক্তি তাঁর **Au Chateau d'Argol** (১৯৩৮), **Un Beau Te'ne'breux** (১৯৪৫), **Le Rivage des Syrtes** (১৯৫১) ইত্যাদি সব উপন্যাস সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

ম'াদিয়ার্‌গ্‌-এর উপন্যাস-চারিত্র্য গ্রাক-এর মতোই। গদ্যে লেখা কবিতা ব'লে তাকেও বর্ণনা করা চলে, তবে রক্তমাংসের স্পর্শ তাতে আরো বেশি। ফরাসীতে যাকে বলে **conte fantastique** তার বর্তমান প্রতিভূ হিসেবে তাঁকে সনাক্ত করা যায়। **Le Muse'e noir** (১৯৪৬), **Soleil des Loups** (১৯৫১), **Feu de Braise** (১৯৫৯) সেই বৈশিষ্ট্যেরই নিদর্শন।

এই ধারার আরো অনেক লেখক আছেন। যেমন, পিয়ের ক্লসোভস্কি (তাঁর একটি গ্রন্থ যেন এক অনামী লেখকের লেখা ঐ নামেরই এক গ্রন্থের ভাষ্য, তিনি ঐ গ্রন্থের এক চরিত্রের আচরণ ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন, ফলে বাস্তব যেন অনিশ্চিত হয়ে ওঠে), মার্সেল শ্নেদের, ঝর্ঝ ল'্যাবুর।

এই লেখকেরা সবাই একটা বিশেষ ধরনে উপন্যাসের চরিত্র বদলানোর কাজে হাত লাগিয়েছেন। উপন্যাসকে তাঁরা দৈনন্দিন জীবন থেকে উঠিয়ে অসাধারণের ঝলকে তুলে ধরেছেন। এরই পাশাপাশি দেখি আর এক ধারা, যা নাটকীয়তাহীন একান্ত দৈনন্দিনকে অবলম্বন ক'রে আমাদের আবেগ-অনুভূতির অনির্দিষ্টতাকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছে। আবেগ-অনুভূতির বিশ্লেষণ নয়, বিভিন্নভাবে তাদের আবাহন। এ-ধারার লেখকদের রচনায় স্মৃতি এবং কালের একটা বড় ভূমিকা আছে, ফলে তাঁদের পূর্বসূরি হিসেবে প্রুস্তকে চিনতে পারা যায়। তাছাড়া, তাঁদের অনেকের রচনাতে কথকই নায়ক, যেমন প্রুস্ত-এর **A la Recherche du Temps perdu**-তে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার লেখক নিজেই সেই নায়ক। তবে প্রুস্ত-এর সঙ্গে একটা বড় তফাৎ এই যে, তাঁরা পাঠকদেরই বানিয়েছেন কথোপকথনের অন্য পক্ষ। এই দিকটা বিবেচনা করলে মনে হয়, "নুভো রম'া"-র ক্ষেত্রে এবং উপন্যাসের পরবর্তী বিবর্তনে এই ধারার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে, অন্তত পূর্বগামী-অনুগামীর আত্মীয়তা রয়েছে। এই শ্রেণীর এক প্রধান লেখক ঝ'া কেরল (জন্ম ১৯১১)। তাঁর বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন তাঁর **Je vivrai l'amour des autres** (১৯৪৬), **Le Vent de la Me'moire** (১৯৫২), **L' Espace d'une Nuit** (১৯৫৪) প্রভৃতি উপন্যাস। তাঁর বর্ণিত মানুষ দেহে ও মনে পঙ্গু। তিনি

নিজের রচনার প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন : "গল্প অথবা আচরণের কোনো উৎস অথবা ঘটনাচক্র থাকে না। এ রকম উপন্যাসের নায়ক অবিশ্রান্ত খাড়া থাকে, কোনো এক প্যাশনের উৎসারে শুধু তার বাঁচার ক্রিয়া, কিন্তু সেই প্যাশনের অগ্রগতি, ছন্দ সে অনুসরণ করে না, তার ভাবনা-পরিকল্পনা নেই, ধাক্কা খেয়ে সে গিয়ে পড়ে বিবিধ কাণ্ডের মধ্যে, কাজের ছত্রভঙ্গতার মধ্যে, বাস্তবের এক রকম বিকৃতির মধ্যে। নায়ক চায় না কেউ তার কথার উত্তর দিক, প্রশ্নই তার পক্ষে যথেষ্ট, তার জিজ্ঞাসাকে সে ত্রিশঙ্কু রাখতে ইচ্ছুক। কখনো কখনো এক ধরনের তৃপ্তি নিয়ে দেখে সামনে অপর পক্ষের অস্বস্তি বাড়ছে।" তাঁর উপন্যাসের স্বগতোক্তিতে কাহিনীর সূত্র বারে বারে ছিঁড়ে যায়, মন্তব্য ও নেপথ্যভাষণ ঢুকে পড়ে, কথোপকথন চালাবার কাল্পনিক কেউ থাকে। কেরল-এর ভাষা সম্পূর্ণ নিরাভরণ, নিরুজ্জ্বল। কথ্য ভাষার ব্যবহারে তিনি সমস্ত রকম চটক বাদ দেন, যা সেলিন এবং ক্যনো-র রীতির বিপরীত।

স্বগতোক্তি এবং মুখের কথার এই ভূমিকা তাঁর কনিষ্ঠ আরো কয়েকজন ঔপন্যাসিকের রচনাতেও প্রধান। তাঁদের মধ্যে আছেন লুই-র‍্যনে দে ফরে (জন্ম ১৯১৮), ইভ রেনিয়ে (জন্ম ১৯১৪), মার্গরিৎ দ্যুরাস (জন্ম ১৯১৪)। দে ফরের **Le Bavard** (১৯৪৩) উপন্যাসে কথার জাল যে-অনিশ্চয়তার মধ্যে পাঠককে নিয়ে যায় তার পরে বাক্যহীনতা ছাড়া আর কোনো উদ্ধার থাকে না। লেখক হিসেবে দে ফরে ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে থাকলেও তাঁর নাম তেমন পরিচিত নয়, কিন্তু দ্যুরাস ভাগ্যক্রমে একটা চিত্রনাট্য লিখেছিলেন : **Hiroshima mon amour**, সুতরাং তাঁর নাম সর্বজনবিদিত। কথা বলার প্রাধান্য তাঁর উপন্যাসেও, তবে তিনি তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেন না। ১৯৫৩ সালে **Petits Chevaux de Tarquinia** লেখার সময় থেকে তাঁর লেখায় বিবরণ আর আমল পায় না, কাহিনীও নয়। মুখ্য হল সংলাপ। কখনো তা অবাধ, কখনো কাটা-কাটা, কখনো বা কিছু রহস্যময় বাক্য। তাঁর মনোযোগের বিষয় হল প্রেম, মৃত্যু, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি। ধারাবাহিক কোনো কাহিনী নয়। কয়েকটা দিনের ঘটনা অথবা কোনো ক্ষণ-সাক্ষাৎ নিয়ে জীবনধারণের উদ্ভাস এবং বিলুপ্তি।

কাহিনী, চরিত্র এবং কালপর্বকে এই যে অনির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া, নায়কের সঙ্গে লেখকের মিশে যাওয়া, স্বগতোক্তির ঝোঁক, কথকের অপর পক্ষ হিসেবে পাঠককে দাঁড় করানো, এক-একটা ঘটনাকে বহু ভাষ্যের কেন্দ্রে স্থাপন করা—

এসব "নুভো রমঁা"র পূর্বগামী লক্ষণ। অবশ্য এ সবের বীজ বহুদিন আগেই বোনা হয়েছিল ফ্রান্সে এবং ফ্রান্সের বাইরে। আসল কথা, দুনিয়া সম্বন্ধে দৃষ্টিবদল। এই সব নব্য ঔপন্যাসিকের কাছে ধারাবাহিক কাহিনীর ঘটনা-পরম্পরায় বা চরিত্রের ক্রমান্বয় বিবর্তনে বাস্তবের সত্য মূর্তি গ'ড়ে ওঠে না। বাস্তব আরো গভীর ও সর্বগ্রাসী। সেখানে লেখকের মন, পাঠকের মন, ঘটনা এবং চরিত্রের অসম্পূর্ণতা, বস্তুর অস্তিত্ব ও অবস্থান, এমনকি লিখনক্রিয়া—এ সবেরই ভূমিকা আছে। এ প্রসঙ্গে লুই আরাগঁর সাহিত্যকর্ম অবশ্যই স্মরণীয়। তিনি কবিতায় যেমন উজ্জ্বল, উপন্যাসে ও অন্য গদ্য রচনাতেও তেমনই। 'দাদা' ও স্যুররেয়ালিস্ত আন্দোলনকালে তাঁর উপন্যাস **Anicet,** গল্প-সংকলন **Libertinage** ও অন্য গদ্য নব্য-রচনার বিশিষ্ট নিদর্শন। স্বপ্নজগৎ বস্তুজগতের সহাবস্থানে পরম বাস্তবের রূপ উন্মোচন করার জন্যে ভাষার দৃকপাতহীন ব্যবহার এবং দৃশ্যবদল তাতে দেখি। সাম্যবাদী আদর্শ গ্রহণ করার পর যদিও আরাগঁ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে তাঁর সাহিত্যকর্মের ভিত্তি ব'লে ঘোষণা করেন, তবুও তাঁর বাস্তববাদী উপন্যাসমালা তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। শেষ পর্যায়ে তাঁর বিখ্যাত তিনটি উপন্যাস **La Semaine Sainte** (১৯৫৮), **La Mise a` Mort** (১৯৬৫) এবং **Blanche ou l'oubli** (১৯৬৭) তাঁকে আধুনিকতম রচনারীতির অন্যতম প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রথম উপন্যাসটির বিষয় যদিও নেপোলিয়নের অভিযান-কাহিনী, কিন্তু রচনায় স্বগত কথন আর স্বপ্নচারিতা এবং লেখকের আত্মপ্রশ্নার তাকে সেই সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে আসে আমাদের জীবনের মধ্যে। নিজের ব্যক্তিত্বের সমস্যা অন্য দুটি উপন্যাসকে আরো গভীরভাবে চিহ্নিত করেছে। বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি ক'রে লেখক সেগুলোকে যেন ভেঙেচুরে দিয়েছেন, বিচ্ছিন্ন আত্মস্বীকৃতির ফলায় কাহিনীর কাঠামোকে বিদীর্ণ করেছেন; অর্থাৎ এ হল অ্যাতি-রমাঁ রমাঁ, উপন্যাস-বিরোধী উপন্যাস।

"নুভো রমাঁসিয়ে" এবং তাদের অনুগামীদের হাতে শিল্পসামগ্রী এবং ভাষাও উপন্যাসের চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাসের একটা বিশেষ সময়ে যে এই নব দৃষ্টিভঙ্গির লেখকদের উদ্ভব হয়েছে তা নিশ্চয় তাৎপর্যপূর্ণ। মনে হয় এর কারণ আমাদের চারপাশের বাস্তব, যেখানে মানুষ কোনো স্থিতি পাচ্ছে না (স্থিতি ব'লে কিছু আছে কিনা এই প্রশ্নই অনেকের মনে জাগে), যেখানে মানুষ হিসেবে

কোনো পৃথক ও প্রকৃষ্ট অস্তিত্ব নেই, যেখানে কিছুই সম্পূর্ণতায় পৌঁছয় না। আর এক লক্ষণীয় বিষয় হল, এই নব্য-ঔপন্যাসিকরা সাহিত্য-ইতিহাসের একটা বিশেষ সময়ে পৃথকভাবে হলেও প্রায় ঐকতানে উপন্যাসের তত্ত্বকথা বলতে শুরু করেছেন। উপন্যাস যদি হয় জীবনের প্রতিচ্ছবি (যার যেমনই হোক জীবনের ধারণা), তবে জীবন এখানে উঠে এসেছে গবেষণাগারে। একে কি বলব মানবিক থেকে অ-মানবিকে যাওয়া? যাই হোক, নাতালি সারোৎ, আলঁ্যা রব-গ্রীয়ে, মিশেল ব্যুতর, ক্লোদ সিমঁ এবং তাঁদের পরবর্তী ফিলিপ সোলের্স্ আর ল্য ক্লেজিও কী করেছেন এবং এখন কী করছেন তা আমরা এরপর দেখব। সেই সঙ্গে অন্যদেরও খোঁজখবর নেব।

'নুভো রমাঁ' এবং অন্য ধারা

'নুভো রমাঁ'র কোনো সহজ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা যে-মানবিকতা আমাদের জীবনের প্রসঙ্গ, তা এতে অনুপস্থিত। এই ধারার লেখকেরা যেন এক অমূর্ত শিল্পের রূপকার। ব্যক্তি, বস্তু সবই আছে তাঁদের রচনায়, এমনকি বেশি পরিমাণেই আছে; কিন্তু তারা কোনো কাহিনীর পারম্পর্যে ব্যবহৃত নয়, তাদের ব্যবহার লেখকের মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য, যে-মানসিকতায় আবার পাঠকের সহযোগিতা লেখক প্রত্যাশা করেন। এই লেখকেরা ভেবেচিন্তে প্রথাগত উপন্যাসের পদ্ধতি এবং ধারণা পালটে দিয়ে তাঁদের 'নব্য উপন্যাস' রচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন। তাঁদের মতে এ-সৃষ্টিতে পাঠক আর নিছক পাঠক নয়, সে অতঃপর গ্রন্থকারের সহযোগী। নাতালি সারোৎ বলেছেন: "দৈনন্দিন জীবনের বিবিধ ব্যবহার যে-সব লক্ষণ পাঠকের সামনে ধরে এবং পাঠক আলস্য ও ব্যস্ততার কারণে যাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদের পরিবর্তে পাঠককে গ্রন্থকারের মতোই চরিত্রগুলো চিনতে হবে ভেতর থেকে এবং সেইভাবে তাদের সনাক্ত করতে হবে। যদি পাঠক তার আরামভোগের অভ্যাস ত্যাগ ক'রে তাদের ভেতরে অবগাহন করে, গ্রন্থকার যতদূর করে ততদূর, তাহলেই সে এমন সব চিহ্ন দেখতে পাবে যা চরিত্রগুলোকে

তৎক্ষণাৎ চিনিয়ে দেবে।" আল্যাঁ রব-গ্রীয়ে বলেছেন: "গ্রন্থকার আজ পাঠককে মোটেই উপেক্ষা করে না। পাঠকের সক্রিয়, সজ্ঞান এবং সৃজনশীল সহযোগিতা যে তার একান্ত প্রয়োজন এই কথাই আজ গ্রন্থকার ঘোষণা করে। একটা তৈরি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথিবীকে পাঠক গ্রহণ করুক তা সে চায় না। সে চায় পাঠক একটা সৃষ্টিকার্যে অংশ নিক, পাঠক নিজের দিক থেকে এই সাহিত্যকর্মকে —এবং পৃথিবীকে—উদ্ভাবন করুক আর এইভাবে উদ্ভাবন করতে শিখুক নিজের জীবনকে।" মিশেল ব্যুতর বলেছেন: "প্রথমে শেখবার আছে একটা বিশেষ ব্যাকরণ, প্রথম পৃষ্ঠাগুলোর সাহায্যে মানুষ পড়তে শেখে।" অর্থাৎ এক নতুন বিশ্ববীক্ষণ, যার অংশীদার হতে হবে পাঠককে। এই বীক্ষণের প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে লিখন-প্রক্রিয়ায়। শেষ পর্যন্ত লিখন তাঁদের সাহিত্যকর্মের বিষয়-বস্তুই হয়ে ওঠে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে মুশকিলও সেইখানে। এই অচেনা পথে চলতে গিয়ে তার দিশেহারা হয়ে পড়াই স্বাভাবিক।

নাতালি সারোৎ-এর প্রথম উপন্যাসের নাম **Tropismes** (লেখার অনেক পরে প্রকাশ ১৯৫৮ সালে)। জীব-বিজ্ঞানের এই অভিধাটি তাঁর সৃষ্টিকর্মেরই সংজ্ঞা বলা যায়। যা দেখানো তাঁর অভিপ্রায় তা হল (তাঁর নিজের ভাষায়) "গভীরতর এবং কম স্থূল সব লক্ষণ, সেই সব ছোট নড়াচড়া, ছোট ঘূর্ণি যা বহিস্তলের নিচে প্রকাশ পায়। এগুলো সব আনুবীক্ষণিক নাটক যা সর্বদা অন্তর্লীন থাকে, যা আমাদের কথাবার্তা এবং আমাদের অতি তুচ্ছ কাজের ভেতর দিয়ে বহিস্তলের ও-ধারে শুধু অনুমান করা যায়।....এইসব নড়াচড়া আর কাজ ফুটিয়ে তোলার জন্যে আমার দরকার হয় উপন্যাসের চরিত্রের সীমান্তে তার চেয়ে প্রাঞ্জল এক চেতনাকে স্থাপন করার।" তার মানে গ্রন্থকারের মানসিকতাই প্রধান ভূমিকা নেয়। ফলে একই বাক্যে তিনি এক চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রে অবাধে চ'লে যান, কেননা গ্রন্থের বিষয়বস্তু তো কোনো একটা চরিত্র নয়, একাধিক চরিত্রের অন্তর্লীন কাছে-আসা বা দূরে-সরা, গ্রন্থকারের চেতনায় যার প্রতিফলন।

শূকের (larva) কথা মনে আসে এবং সে-প্রসঙ্গে স্যামুয়েল বেকেট-এর রচনার কথা। প্রথাভাঙা উপন্যাসের প্রধান পুরোধা হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যেমন কাফকা এবং জয়েস-এর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না, তেমনি ফ্রান্সের পটে উপেক্ষা করা যায় না বেকেট-এর নিকট-ভূমিকা। এই আইরিশ লেখক গত মহাযুদ্ধের পর থেকে প্রধানত ফরাসীতেই লেখেন। তাঁর খ্যাতি

যদিও বিশেষ ক'রে তাঁর নাটকের জন্যে, তবু উপন্যাসেও তিনি বিশিষ্ট। তাঁর গোড়ার দিকের উপন্যাসে (প্রথমে ইংরিজীতে, পরে ফরাসীতে) সম্বন্ধ কাহিনীর যে-ধাঁচটুকু ছিল তা ভেঙে দিয়ে তিনি ক্রমেই এগিয়ে গিয়েছেন এক নিরাকারত্বে, যার নিদর্শন তাঁর **L'Innombrable** (১৯৫৩), **Nouvelles et textes pour rien** (১৯৫৫), **Comment c'est** (১৯৬০)। সমালোচক মার্সেল ঝিরার-এর ভাষায় তারা "দেখায় এমন একটাই চরিত্র যা শূকতুল্য, কিন্তু যন্ত্রণা-গ্রস্ত এবং শেষ পর্যন্ত সহানুভূতি যোগ্য। চূড়ান্ত নীরবতার আগে পর্যন্ত সে অন্তহীন আবোলতাবোল বকে। বোঝা যায় না, তা ভবিষ্যৎ মানবতার উর্বর পঙ্ক, না পচ-ধরা পৃথিবীর শেষ গলন।"

সারোৎ-এর **Portrait d'un inconnu** (১৯৫৭), **Le Planetarium** (১৯৫৯), **Les Fruits d'or** (১৯৬৩), **Entre la vie et la mort** (১৯৬৮) ইত্যাদি গ্রন্থে ঘটনার চারিত্র্য তার তুচ্ছতায়, এবং ক্রমেই সেখানে বেশি ক'রে প্রকাশ পায় ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে অনির্দেশ্যতা এবং চরিত্র ও গ্রন্থ-কারের মনোভাবের একাকারত্ব। এ সব লক্ষণ এই ধারার অন্য লেখকদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। **Les Fruits d'or** এবং **Entre la vie et la mort** গ্রন্থ দুটির বিষয়বস্তু তো একটা পুস্তকের জীবন ও স্থায়িত্ব এবং সাহিত্যকর্মের জন্ম। সুতরাং নায়কনায়িকা বা ঘটনাচক্রের আকর্ষণ সেখানে থাকে না, সবই খণ্ড খণ্ড মুহূর্তের এবং বিচ্ছিন্নের সমাবেশ।

আলঁ্যা রব-গ্রীয়ে ব্যাপৃত হন বস্তু, পরিবেশ ও সময়ের নিরাসক্ত খুঁটিনাটি বর্ণনায়। কাহিনীর মতো কিছু একটা আসে, কিন্তু তা কেটে যায়, ঘুরে ফিরে বর্ণনায় মিশে যায়। **Gommes** (১৯৫৩)-এ রহস্য-কাহিনীর আভাস, **La Jalousie** (১৯৫৭)-তে প্রেম ও ব্যভিচারের বিষয়, **Dans le Labyrinthe** (১৯৫৯)-এ পলাতক সৈনিকের কাউকে খোঁজার অ্যাডভেঞ্চার, **La Maison de rendez-vous** (১৯৬৫)-তে যৌনতা ও চণ্ডতার ছবি বিবিধ বিবরণের বিস্তারে আর পুনরাবৃত্তিতে যেন হারিয়ে যায়। কাহিনী গড়া স্পষ্টতই তাঁর উদ্দেশ্য নয়, গ্রন্থকার হিসেবে তাঁর কাজ হল একটা সাহিত্যকর্মকে আকার দেওয়া। বড় জোর বলা যায় তিনি "চক্রবৎ ঘূর্ণমান (দিন, বছর) অথবা অপরিবর্তনীয় (বস্তু) জগৎকে মানুষের জরগ্রস্ত হাঁকপাকের প্রতিপক্ষ হিসেবে" স্থাপন করতে চান। তাঁর রচনা-পদ্ধতি একটা বড় ভূমিকায় থাকে। তা যেন তাঁর জগদ্দৃষ্টিরই প্রকাশ। বিশেষ ক'রে **Dans le Labyrinthe** এবং **La**

Maison de rendez-vous-তে এটা লক্ষ্যে আসে। আমাদের জানা পৃথিবীর নিয়মকানুন সেখানে খাটে না। পরস্পর-বিরোধিতা এবং বিভিন্ন ক্রিয়া ও অস্তিত্বের এককালীনতা সেখানকার বিধি। যে-সব ঘটনা পড়া গেল, তাদের পাশে অন্য সব সম্ভাব্য ঘটনা এসে জুটে যায়, সব উপাদান আবার নতুন কাঠামোয় সম্মিলিত হয়: যেন মানুষের সমগ্রতা কাল্পনিক একটা সংগঠন, যেন "ব্যক্তি-মানুষ মূলত রূপকল্প, শব্দ এবং অনুমেয় প্রতিক্রিয়ার সমাহার।" রব-গ্রীয়ে পাঠককেও এই দৃষ্টির সঙ্গী ক'রে নিতে চান।

মিশেল ব্যুতর-এর লিখন-পদ্ধতির ক্ষেত্রে সমালোচকরা যে-বৈশিষ্ট্য প্রথমেই উল্লেখ্য মনে করেন তা হল তার খণ্ডতা। উপন্যাস খণ্ডরূপ নেয় কখনো দিন-পঞ্জীর আকারে, যেমন L'Emploi du temps (১৯৫৬)-এ, কখনো বা ছাত্রদের ক্লাস-পড়ার আকারে, যেমন Degré (১৯৬০)-তে। এই খণ্ডতা গ্রন্থের বিশেষ গঠনটাকেই বড় ক'রে তোলে, এমনকি সেটাই যেন গ্রন্থের সত্যিকার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। গ্রন্থকারই নায়ক, কথক ও অনুসন্ধানী। এবং ঘটনা, সংলাপ ও আচরণের সূত্রে পৃথিবীর অর্থাৎ কোনো এক জায়গার জটিলতায় পাঠক জড়িয়ে পড়ে, অন্তত লেখকের পরিকল্পনা সেই রকম মনে হয়। পাঠককে জড়িয়ে নেবার চেষ্টা তাঁর La Modification (১৯৫৭)-তে স্পষ্ট, কেননা লেখাটাই সম্বোধন ক'রে, মধ্যম পুরুষে। গ্রন্থের চরিত্র এবং পাঠক একাকার। এক ঘণ্টা ক্লাসের বিবরণ আছে Degré-তে, অন্য লেখকদের উদ্ধৃতির বুনন আছে তাতে। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত Mobile-এ ব্যুতর উদ্ধৃতি ছাড়িয়ে চ'লে গিয়েছেন 'কোলাজে': দোকানের ক্যাটালগের অংশ, প্রেসিডেন্ট জেফারসনের বক্তৃতা, মোটরগাড়ির রং, আইসক্রীমের সুবাস ইত্যাদি সব পাশাপাশি বসিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবিম্বন। খণ্ডরূপ আরো বেড়েছে এতে। ফরাসী সমালোচকের কথায় বলা যায়, "এইভাবে সাহিত্যিক সৃজনের দ্বারাই সাহিত্যিক সৃজন সম্বন্ধে একটা ধারণাকে আমূল নাড়িয়ে দেওয়া হয়। লেখক আর সেই প্রতিভাবান দেবতা নন যিনি সৃষ্টি করেন শূন্য থেকে, লেখক সেই ব্যক্তি যিনি বিদ্যমান সমস্ত রকম রচনার বিশেষ কিছু উপাদান বাছাই ক'রে সাজান।"

ক্লোদ সিমঁ তাঁর পদ্ধতির কথা তাঁর উপন্যাস Histoire (১৯৬৭)-এর মধ্যেই বলেছেন। তাঁর পদ্ধতি পুরোনো ফিল্মের মতো: "জীর্ণ ছেঁড়াছোটা তালিমারা পুরোনো ফিল্ম যার এক-একটা পুরো অংশই খোয়া গিয়েছে, ফলে পরিচালকের একঘেয়ে বিবরণের বদলে কাঁচি, জোড়াতালি আর জীর্ণতার সাহায্যে কর্মকাণ্ডকে

তার প্রচণ্ড বিচ্ছিন্নতায় পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে।" তাঁর **Le Vent** (১৯৫৭)-এ যে-রীতির আভাস ছিল, তা এই গ্রন্থে এবং **La Route des Flandres** (১৯৬০), **Le Palace** (১৯৬২) ইত্যাদিতে তিনি আরো প্রসারিত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি খণ্ড খণ্ড স্থান ও কালের দূরত্ব লুপ্ত ক'রে কথকের চেতনায় তাদের পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট করেন। বাস্তব ঘটনাশ্রিত সময় তাঁর রচনায় একটা প্রধান ভূমিকা নেয়। নিকট দূর সমস্ত ঐতিহাসিক ও ব্যক্তিগত ঘটনা পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়। সিমঁ তাঁর বিষয় অনুযায়ী এক বিচ্ছিন্নতাধর্মী ভাষাও গড়েছেন: ছেদচিহ্নিত বাক্যের সম্পূর্ণতা অন্তর্ধান করেছে, এক বাক্যের মধ্যেই নানান গতায়াত, অনেক আগের অসমাপ্ত প্রসঙ্গের আবার ফিরে আসা, একটা কিছু বলতে বলতে অন্য প্রক্ষিপ্ত প্রসঙ্গের দীর্ঘ অবতারণা।

'নুভো রমাঁ'র এই চার প্রধান ১৯৭০ সালের পর যা লিখেছেন, তা তাঁদের ঐ গবেষণারই সম্প্রসারণ। যথা সারোৎ-এর **Vous les entendez** (১৯৬২), রব-গ্রীয়ের **Projet pour une re´volution a` New York** (১৯৭০), ব্যুতর-এর **Ou`** (১৯৭১) ও **Intervalle** (১৯৭৩) এবং সিমঁর **Orion aveugle** (১৯৭০), **Les corps conducteurs** (১৯৭১)। তাঁদের এই অধুনাতন সাহিত্যিক সৃজনকর্মকে কোনো কোনো ফরাসী ভাষ্যকার সাঙ্গীতিক রূপের সঙ্গে উপমিত করেছেন। ইয়োরোপীয় সঙ্গীতে যেমন একটি **theme** এবং তার **variation** থাকে, এখানেও তেমনি। সারোৎ বাস্তব বা কাল্পনিক এক-একটা পরিস্থিতিকে কয়েকবার উপস্থিত করেছেন এবং প্রত্যেক বার ভিন্ন রকমে, ফলে প্রাথমিক উপাদানগুলোকে বিন্যস্ত করার এবং তাদের সম্পর্ক আবিষ্কার করার নতুন নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রব-গ্রীয়েও তেমনি সস্তা উপন্যাসের প্রচ্ছদলিপি, ফিল্ম, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির জনপ্রিয় প্রকাশরূপগুলোকে কাজে লাগিয়ে নানান **variation** রচনা করেছেন, যা নিউইয়র্কের কোনো রাস্তা বা মেশিনগানের গুলি বা কোনো সুন্দরী গুপ্তচর হয়তো তাঁর মনে জাগিয়ে দিয়েছে। আর ব্যুতর? তিনি **Ou´**-তে প্যারিস শহরের আকর্ষণ-বিকর্ষণকে কেন্দ্রে রেখে যোজনা করেছেন ভ্রমণপঞ্জী, সংলাপ, কাব্যিক ঘোষণার উদ্ধৃতি, গাইডবুকের পৃষ্ঠা। **Intervalle**-এ একটা বিষয়েরই **variation** কার্যত লিখনক্রিয়াকেই বিষয় ক'রে তুলেছে। এক পুরুষ ও এক নারীর ক্ষণিক সাক্ষাৎ নিয়ে তিনি সিনারিওর আকারে একটা খসড়া রেখেছেন, অর্থাৎ সেটার অদল-

বদল হয়। পাঠক চোখের সামনে নতুন পাঠ্যকে রূপ নিতে দেখে এবং রচনার রহস্য তার কাছে উন্মোচিত হয়। ফলে সাক্ষাৎটা ব্যাপক তাৎপর্যে ঘটে গ্রন্থকারের সঙ্গে তাঁর রচনার, গ্রন্থকারের সঙ্গে পাঠকের এবং নিজের সঙ্গে পাঠকের। আর সিমঁ তাঁর এই সব রচনার চারিত্র্য নিজেই নির্দেশ করেছেন: "লিখনক্রিয়া যেভাবে অগ্রসর হয় তা ছাড়া আমার কাছে সৃষ্টির অন্য পথ নেই।......শব্দগুলো একটার পর একটা রোমান বাতির মতো ফেটে পড়ে এবং তাদের রশ্মি চারদিকে ছুটে যায়। তারা হল চৌমাথা যেখান থেকে একাধিক রাস্তা বেরিয়েছে।"

'নুভো রমাঁ'র পরবর্তী প্রজন্মে জনসংখ্যা স্বভাবতই আরো বেশি। তবে অনেক শিশুমৃত্যুও ঘটেছে। হয় পুষ্টির অভাবে, নয় অপরিণত মস্তিষ্কের কারণে। যাঁরা বেঁচেবর্তে আছেন, অল্প পরিসরে তাঁদের সকলের পরিচয় দেওয়া যাবে না। দুজনের কথা এখানে বলা যেতে পারে: ফিলিপ সোলেরস্ (জন্ম ১৯৩৬) এবং ল্য ক্লেজিও (জন্ম: ৯৪০)।

উপন্যাসকে কাহিনী থেকে ভাষার দিকে, বহির্বিশ্ব থেকে আন্তর চেতনার দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্যম 'নুভো রমাঁ'র। তার আচরণে যে-বিরুদ্ধতা প্রকাশ পায় তা বাহ্যত সাহিত্যের একটা প্রচলিত 'ফর্ম' সম্পর্কে বটে, কিন্তু আসলে সমাজ ও তার সংস্কৃতি সম্পর্কে, মানুষ ও তার ভাষা সম্পর্কে। সোলেরস্ একে তাঁর মতো ক'রে একটা রূপ দিয়েছেন। ১৯৬০ সালে 'তেল কেল' (**Tel Quel**) পত্রিকাকে ঘিরে তাঁর তৎপরতা শুরু হয় এবং ক্রমে ও পত্রিকার লেখকেরা এক গোষ্ঠী গ'ড়ে তোলেন। এঁরা সাহিত্যিক ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন সাহিত্যের বদলে লিখনের উপর। সোলেরস্ তাঁর **Drame** (১৯৬৫) গ্রন্থে যে-নাটকীয় বস্তু উপস্থিত করেছেন তা হল একটা ভাষার উদ্ভাবনের নাটক। এতে দেখা যায় এক নিদ্রা থেকে আর এক নিদ্রার মধ্যে দৃশ্য ও চিন্তার চিত্রণ, চিন্তাকে তার উৎসে ধরার চেষ্টা, একটার পর একটা ছবি যা ঘুরে ঘুরে এক জায়গায় মেলে। কাহিনী নয়, আছে ঘটনা। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে নিজের ব্যাখ্যায় (?) লেখক বলেছেন: "আমরা বর্তমানে রয়েছি, কথার দৃশ্যমঞ্চে। এই কথা দুভাগ হয়ে যায়, একই সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ, তা একবার দেওয়া হয় এক কোরাসের মুখে (সর্বনাম 'সে' যার প্রবক্তা), একবার দেওয়া হয় ব্যক্তির মুখে (সর্বনাম 'আমি' যার প্রবক্তা)।" সোলেরস্-এর ভাষামুখী মনোগতি ক্রমে আরো এগিয়ে গিয়েছে। তার **Lois** (১৯৭২)-তে

তিনি ফরাসী ভাষারই যেন রূপান্তর ঘটাতে চেষ্টা করেন। গালিগালাজ এবং নতুন শব্দ নির্মাণ, শব্দের খেলা এবং উদ্ধৃতি, এইসবের মধ্যে রচনা বিস্তৃত হয়; মানুষের জ্ঞানকে কখনো করা হয় আবাহন, কখনো বিদ্রূপ, কখনো উপেক্ষা, কখনো স্বীকার।

ল্য ক্লেজিওর উদ্যম কিছু অন্য রকমের। তিনি জীবন্ত পৃথিবীর অনুভবটা নিয়ে আসেন, কিন্তু লিখনের ভূমিকা এখানেও মুখ্য। তাঁর **Proce's verbal** (১৯৬১) গ্রন্থে একজন নায়কও আছে, কিন্তু গ্রন্থকারের পদ্ধতি হল "প্রত্যেক আচরণ, প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক অনুভূতিকে লক্ষ লক্ষ সদৃশ আচরণ, বস্তু ও অনুভূতির নমুনা হিসেবে" উপস্থিত করা। **La Fie'vre** (১৯৬৫)-এ লিখন ব্যাপারটাই প্রধান হয়ে দেখা দেয়, তাতে সর্বনাম 'সে' ও 'আমি' ইচ্ছেমতো বদল করা হয়। এ-গ্রন্থে এক চরিত্র বলে: "কাব্য নেই, প্রবন্ধ নেই, উপন্যাস নেই, আছে শুধু অশোধিত রূপে লিখন।" তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ **La Guerre** (১৯৭০) এবং **Les Ge'ants** (১৯৭৩)-তেও এই রীতি অক্ষুন্ন।

অর্থাৎ এইসব লেখকের কাছে শব্দ ব্রহ্ম নয়, শব্দ ব্রহ্মাণ্ড। এবং সে-ব্রহ্মাণ্ড ভেঙে চুরে শতখণ্ড। তাই "নব্য-ঔপন্যাসিকদের" রচনায় যে-সামান্য লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করে তা হল ছিন্নবিচ্ছিন্নতা। পৃথিবীর এক বিভ্রান্তিকর মূর্তি যেন সেখানে ছায়া ফেলে, পায়ের নিচে জমি পাওয়া যায় না। সবটাই যেন বর্জনের, বিনা দ্বিধায় গ্রহণের কিছু নেই। সে যাই হোক, কিন্তু রচনার শ্রেণী বিচারে একে উপন্যাস কেন বলতে হবে, সেটাই এক প্রশ্ন। প্রচলিত উপন্যাসের প্রতিবাদে যে-সাহিত্য তাঁরা লিখছেন, তাকে উপন্যাস নামাঙ্কিত করার দুর্বলতা তাঁদের দমন করাই উচিত ছিল মনে হয়। নামে তো কতই হয়, শব্দ নির্মাণে তাঁদের ক্ষমতাও প্রমাণিত। একটা কিছু নিশ্চয় ঠিক করা যেত। যেমন ধরুন, বাংলাতে ভাবলে একে উপন্যাস না ব'লে বলা যায় 'নবন্যাস' অথবা একাধিক অর্থে 'অনুপন্যাস'। আঁতি-রমাঁ রমাঁ বা অ্যান্টি-নভেল নভেল তো তাঁদেরই দাবী, সেই সঙ্গে আবার তুলনাহীনও বটে।

উপন্যাসের স্বভাবচরিত্র বদলাবার কাজে এঁদের অব্যবহিত আগে যাঁরা হাত লাগান, তাঁদের বিবর্তনও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। আঁদ্রে পিয়ের দ্য মাঁদিয়ার্গ, তাঁর 'কঁং ফাঁতাস্তিক'-এর অভ্যস্ত ধাঁচটা রেখেছেন বটে, তবে তিনি লিখন-বস্তুর দিকে আরো বেশি ঝুঁকেছেন অর্থাৎ নুভো রমাঁ পদ্ধতির দিকে। তার **Mascarets** (১৯৭১)-এ তা স্পষ্ট। লিখন-সম্পর্কিত গবেষণা

এতে প্রচুর। কিন্তু ম্যুলিয়ঁ্যা গ্রাক তাঁর রীতিতে অটল আছেন। তাঁর La Presqu'ile (১৯৭০)-এ তা আবার ফুটে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই গ্রন্থের তিন 'কাহিনী'র মধ্যে একটিতে এক পুরুষ এক স্ত্রীলোকের জন্যে অপেক্ষা করে, তাকে খোঁজে, খুঁজে পায়ও, কিন্তু খোঁজাটাই যেন তার কাছে বেশি আকর্ষণ মনে হয়। মানে কিছুই কোনো পরিণতিতে পৌঁছয় না। শুধু যেন প্রতীক্ষা এবং ঘটনার আভাস। ঝাঁ কেরল ১৯৬৯-৭৩-এ তিনটি বই বের করেছেন : Histoire d'une prairie, Histoire d'un désert, Histoire de la mer। এই প্রান্তর, মরুভূমি ও সমুদ্রের 'বৃত্তান্তে' তাঁর দৃষ্টির ধাঁচ কিছু বদলেছে; তবে আগেকার স্মৃতি-জাগরণ সূত্র তেমনি আছে। এই গ্রন্থ তিনটিকে "খণ্ড-খণ্ড মানব-সংস্কৃতির এক ব্যঙ্গাত্মক বিশ্বকোষ" ব'লে একজন সমালোচক বর্ণনা করেছেন।

উপন্যাসে এই নতুন খাতের পাশে পুরোনো খাতে স্রোত কিন্তু যথেষ্ট বেগবান রয়েছে। যথেষ্ট বলাও যথেষ্ট নয়, বলতে হয় প্রবলভাবে বেগবান, সবচেয়ে বেগবান, যদি চাহিদা ও সরবরাহ বেগবত্তার নির্ণয় হয়। যাকে বলা হয় উপন্যাসের প্রচলিত বা প্রথাগত ধারা, পাঠক-জগতে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্ব এখনো সুদূরপরাহত।

প্রসঙ্গত, সাহিত্যের এই বিভাগে ক্রমশ বেশি সংখ্যায় মেয়েদের আত্ম-প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। সেই সতেরো শতকে মাদাম দ্য লাফাইয়েৎ থেকে আরম্ভ (তাঁর La Princesse de Clèves সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম আধুনিক উপন্যাস), তারপর আঠারো-উনিশ শতকের মাদাম দ্য স্তাল (জন্ম-বিচারে সুইস), উনিশ শতকে ঝর্জ সাঁদ। তিনটি উজ্জ্বল নাম। তারপর বিশ শতকে কোলেৎ, সিমন দ্য বোভোয়ার। ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এমন নাম উনিশ ও বিশ শতকে আরো আছে, যেমন সেভ্রিন, রাশিল্দ, মারগরিৎ ওদু, মারগরিৎ ইয়ুর্সনার, এলসা ত্রিয়োলে (জন্মে রুশ)। আলোচিত ফ্রাঁসোয়াজ সার্গঁ, মারগরিৎ দ্যুরাস এবং নাতালি সারোৎ তো আছেনই। উপন্যাসে মেয়েদের আত্মপ্রকাশ দুই অর্থে : ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রচলিত রীতির ক্ষেত্রে নারী জীবনের প্রবক্তা হিসেবে। তাঁদের রচনায় নারীর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার এলাকার উপর আলো পড়ে, বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে মানব-সম্পর্কের জরিপ হয়। এ-বিষয়ে আমাদের কালে সচেতন পথিকৃৎ রূপে যিনি স্মরণীয় তার নাম সিমন দ্য বোভোয়ার। তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থ Le Deuxième Sexe, তাঁর আত্ম-

জীবনীর খণ্ড কয়টি এবং তাঁর পরবর্তী কাহিনী-গ্রন্থ Les belles images (১৯৬৫) ও La Femme rompue (১৯৬৭) নারীর পরিস্থিতি ও সমস্যারই চিত্রণ, রহস্য-যবনিকার আড়ালে-রাখা বাস্তবের উন্মোচন। এই ধারায় সাম্প্রতিক কালে যে-রমণীরা লিখেছেন তাঁদের স্বর কিন্তু রমণীয় নয়, কেননা তাঁদের কণ্ঠে রমণীসুলভ ব্রীডা নেই, তাঁরা পুরুষের মতোই নিজেদের বক্তব্যে সতেজ এবং অকুণ্ঠ। ক্রিস্তিয়ান রশফর তো ১৯৫৮ সালে তাঁর Le Repos du guerrier প্রকাশ ক'রে হৈচৈ বাধিয়ে দেন। জন্তুসদৃশ পুরুষের দ্বারা এক যুবতীর যৌন আচ্ছন্নতার এই কাহিনী যেন সমাজ-প্রচ্ছদকে এক টানে ছিঁড়ে ফেলে। তাঁর পরবর্তী রচনা Les petits enfants du sie`cle (১৯৬১)-এ আধুনিক সংসারের ভেতরকার অবস্থা তিনি সকৌতুকে বিবৃত করেছেন। সাহস আর একজনও দেখিয়েছেন: ফ্রাঁসোয়াজ মালে-ঝরিস (জাতিতে বেলজিয়ান)। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর প্রথম বই Le Rempart des Be'guines (১৯৫১) প্রকাশ ক'রে। এ উপন্যাস জীবনের জটিল পথে এক তরুণীর চলার কাহিনী, যা থেকে যৌন ব্যাপার বাদ যায়নি। ক্রমে তিনি ঝুঁকেছেন বালজাকী বাস্তবতার দিকে। তাঁর Les Personnages (১৯৬১) উপন্যাসে তিনি সতেরো শতকের পটভূমিতে এক তরুণীর অন্তরঙ্গ নাটককে রূপায়িত করেছেন।

যে-কোনো সৃজনশীল লেখকের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তো নিজের জীবনের সঙ্গে জড়ানো। সুতরাং তাঁর কাছে উপন্যাস ও আত্মজীবনী যেন চৌকাঠের এধার-ওধার, পা বাড়ালেই একটা থেকে অন্যটায়। এই পারাপারটা ফ্রান্সে ইদানীং বেশ নজরে পড়ে। আত্মজীবনের নানা টুকরো অনেক সময় এমনিতেই উপন্যাসে থেকে যায়, কিন্তু তা বাদেও নিজের জীবন নিয়েই এমন রচনা সম্ভব যাতে উপন্যাসের স্বাদ আসে, যদি অভিজ্ঞতায় বৈচিত্র্য থাকে, অনুভূতিতে প্রখরতা থাকে এবং থাকে আবিষ্কারী দৃষ্টি। তারই নিদর্শন ভিয়োলেৎ ল্যদ্যুক-এর তিনটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ: La Batarde (১৯৬৪), La Folie ent ete (১৯৭০) এবং La Chasse a lamour (১৯৭৩)। এতে লেখিকা তাঁর জীবন-পরিক্রমার ছবি এঁকেছেন যৌনতার চড়া রঙে, সমকামিতাসহ। রচনার মুনশিয়ানা তাকে স্থূল ঘটনা-বিবরণী হতে দেয়নি, সাহিত্যের লক্ষণে তা বিশিষ্ট। তাঁর লেখার ভঙ্গি ঝাঁ ঝানের Journal du voleur-কে মনে করিয়ে দেয়। যৌনতার প্রসঙ্গ যাই থাক, যতই থাক, বিভিন্ন বিচিত্র অভি-

জ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সমস্ত দুর্গত মানুষের সঙ্গে একাত্মতার অনুভবই এই জীবন-কাহিনীর আসল কথা।

উপন্যাস এবং আত্মজীবনীর এই সংলগ্নতা এর আগেই প্রকাশ পেয়েছে। দুজনের নাম করা যায়: মিশেল লেরিস (জন্ম ১৯০১) এবং ফ্রাঁসোয়া নুরিসিয়ে (জন্ম ১৯২৭)। স্যুররেয়ালিজম-এর অন্যতম প্রধান সমর্থক লেরিস-এর আত্মজীবনী ছিল অন্তর-ভ্রমণ এবং স্বপ্ন-প্রয়াণ, যার পরিচয় তাঁর **Aurora** (১৯২৭-২৮), **L' Afrique fantome** (১৯৩৪), **L'Age d'homme** (১৯৩৯) ইত্যাদি। নুরিসিয়ের ক্ষেত্রে আত্মজীবনী উপন্যাসের গুণ নিয়েছে বিশ্লেষণমূলক চরিত্রায়ণে এবং সূক্ষ্ম জটিল গূঢ়ৈষার চিত্রণে। যেমন, তাঁর **Bleu comme la nuit** (১৯৫৮), **Un petit bourgeois** (১৯৬৩) প্রভৃতি গ্রন্থে।

আত্মচরিতকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সঙ্গে যুক্ত ক'রে উপস্থাপন করবার একটা প্রবণতাও ঔপন্যাসিকদের মধ্যে লক্ষ করা যায়, যার এক দৃষ্টান্ত পাই আঁদ্রে মালরোর **Anti-me´moires**-এ। ইদানীং এ-ধরনের রচনা আরো দেখা যাচ্ছে: সাম্প্রতিক ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক'রে নিজের ব্যক্তিত্বের নিরূপণ। যেমন, ক্লোদ রোয়ার (জন্ম ১৯১৫) **Moi je** (১৯৬৯) ও **Nous** (১৯৭২)। সাম্প্রতিক ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস লেখার প্রবণতাও লক্ষণীয়। নুরিসিয়ে নিজেই এই মোড় নিয়েছেন তাঁর **Cre´ve** (১৯৭০) এবং **Allemande** (১৯৭৩)-এ। সাধারণভাবে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুও ইদানিং ঔপন্যাসিকদের মনোযোগ যথেষ্ট আকর্ষণ করেছে। লক্ষণীয় হল এই যে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঐতিহাসিক ঘটনার নাটকীয়তা নিয়ে ব্যাপৃত নন। তাঁরা যেন চেষ্টা করছেন তার সূত্রে মানব-সংস্কৃতির উদ্ভব ও তাৎপর্য ধরতে। যেমন ঝাঁ দ্যুভিনেো তাঁর **L'Empire du milieu** (১৯৭১)-তে এবং সিমন ঝাকমার তাঁর **La Thessalienne** (১৯৭৩)-এ। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঝাঁ-পিয়ের শাবরল-এর **Le Canon Fraternite´** (১৯৭১) এবং সেসিল স্যাঁ-লরাঁর **La Communarde** (১৯৭১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, পারী কম্যুন-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কম্যুনকে বিষয়বস্তু ক'রে গ্রন্থ দুটি লেখা। প্রথমটির দৃষ্টিভঙ্গি বামপন্থী, দ্বিতীয়টির দক্ষিণপন্থী। সেসিল স্যাঁ-লরাঁ (আসল নাম ঝাক লরাঁ, জন্ম ১৯১৯) যে দক্ষিণপন্থী হবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা তিনি রজে নিমিয়ের সেই 'পা-ছাড়া' ধারার এক প্রতিনিধি। প্রথমে

তিনি **Caroline che'rie** (১৯৪৭) এবং ঐ ধরনের আরো কয়েকটি আদি-রসাশ্রিত ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে বেশ নাম আর পয়সা করেন। তারপর ১৯৭১ সালে নিজের আসল নামেই লেখেন **Les Botises,** গঁকুর পুরস্কারও পান। এ-উপন্যাসের বিন্যাস বিভিন্ন স্তরে, যেমন আঁদ্রে ঝিদ-এর উপন্যাস **Les Faux-Monnayeurs**-এর। ১৯৪০ সালে মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ফ্রান্সের পরাজয় ও পরে মুক্তি, ভিয়েৎনাম ও আলজিরিয়ার লড়াই, বৈষয়িক ভোগ-বৃত্তে ঘোরা জনসমাজ, এ সবের মধ্যে দিয়ে যে চলেছে—এমন এক দক্ষিণপন্থী যুবকের জীবন-কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়। সাধারণ পাঠকের কাছে লর্ঁার প্রধান আকর্ষণ তাঁর বলার বেপরোয়া ভঙ্গি, যেমন ছিল নিমিয়ের। এ-ধারার অন্য দুজন লেখকের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে : আতোয়ান ব্ঁল্যা এবং মিশেল দেঅঁ।

কাহিনী ও চরিত্রকে নস্যাৎ ক'রে যাঁরা লিখছেন তাঁদের পাশাপাশি এই সমস্ত লেখককেই বলা যায় প্রচলিত ধারার অনুসারী। পাঠকসমাজে এঁদের সমাদরই বেশি, অনেক বেশি। এঁদের মধ্যে বিভিন্ন লেখকের শ্রেণী ও মান অবশ্যই বিভিন্ন, কিন্তু সাধারণভাবে এঁদের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ লোকে এঁদের লেখা প'ড়ে বুঝতে পারে, অনুভব করবার কিছু থাকলে অনুভব করতে পারে এবং ভাববার থাকলে ভাবতেও। 'নুভো রমাঁ'র গুরুশিষ্যেরা এই প্রথাগত ধারার উপন্যাসকে সামাজিক ভোগদ্রব্যের কোঠায় ফেলে যতই বিদ্রূপ করুন, একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকে যাচ্ছে : পাঠক-সাধারণের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও আবেগ যদি নাগাল না পায় তাহলে তাঁদের নব্য-সৃষ্টিকে তারা ধরবে কী দিয়ে? ফরাসী কবি ঝ্যুল স্যুপেরভিয়েল-এর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে তারা জনে জনে বলতে পারে :

> কোন্ হাত দিয়ে ধরব এই ভাবনাকে?
> কোন্ হাতে? আমার কি সেই হাত আছে?

১৯৭৮-৭৯

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে এবং পরবর্তী কালে জন্মেছেন এমন যে-সব লেখকের উল্লেখ এই গ্রন্থে করা হয়েছে তাঁদের নাম মূলের হরফে নিচে দেওয়া হল। অবশ্য ফরাসী accent চিহ্ন সর্বত্র বসানো সম্ভব হল না।

Alain Robbe-Grillet
Albert Camus
André Dhotel
André Malraux
André Pieyre de Mandiargues
Antoine Blondin
André Breton
André Schwarz-Bart
Alain Fournier
Boris Vian
Christiane Rochefort
Claude Chabrol
Claude Roy
Claude Simon
Elsa Triolet
Francis Ponge
Francoise Mallet-Joris
Francoise Sagan
Francois Nourissier
Georges Bataille
Georges Limbour
Guillaume Apollinaire
Guillevic
Hervé Bazin
Henri Michaux
Jacques Prévert
Jacques Laurent
(Cecil Saint-Laurent)
Jean Cayrol
Jean Duvignaud
Jean Follain
Jean Genet
Jean-Paul Sartre
Jean Paulhan
Jean-Louis Curtis
Jules Supervielle
Julien Gracq
Le Clézio
Louis-René des Forets
Louis Aragon
Louis-Ferdinand Céline
Marcel Schneider
Marguerite Duras
Marguerite Yourcenar
Michel Butor
Michel Déon
Michel Leiris
Maurice Druon
Michel de Saint-Pierre
Nathalie Sarraute
Philippe Sollers
Pierre Klossowski
Pierre Reverdy
Pierre Jean Jhuve
Raymond Queneau
Roger Nimier

Roger Vailland
Paul Eluard
Pierre Emmanuel
Rene´ Char
Rboert Desnos
Romain Gary
Simone de Beauvoir
Simonne Jacquemard
Samuel Beckett
Saint-John Perse
Tristan Tsara
Violette Leduc
Vercors
Yves Re´gnier